দ্বিতীয় অধ্যায়

(সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ঙ্খ সময়ের নতুন সমিধ)

জলতিমির

এক

> Time talks .It speaks more plainly than words. The message it conveys comes through loud and clear. Because it is manipulated less consciously, it is subjcet to less distortion than the spoken language.It can also shout the truth where words lie.'[১]

চির নবায়মান বহুস্বরিক সময় প্রতিমুহূর্তে নিজেকে বদলাচ্ছে। এই পাল্টে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় শারিক করে নিচ্ছে আমাদের চিরপরিচিত বিশ্ব, সেইসঙ্গে আমাদেরকেও। একই সঙ্গে সে সৃষ্টি ও ধ্বংসকারী। নতুন নতুন চিহ্নায়ককে সে যেমন সৃষ্টি করছে তেমনি সেই চিহ্নায়ককে আবার ধ্বংসও করছে। এই নির্মাণ পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ প্রক্রিয়াকে লিখিত মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে অক্ষরশিল্পীগণও অবিরতভাবে গ্রন্থিমোচন ও গ্রন্থিবিস্তার করে যাচ্ছেন। থাকছে না আর নিটোল আদি মধ্য ও অন্তের লেখক নির্ধারিত টানেল সদৃশ কোনো কাহিনি। গ্রন্থিল সময়ের নতুন সমিধকে ধারণ করার প্রচেষ্টায় ঔপন্যাসিকেরাও চিরনবায়মান প্রক্রিয়ায় নিজেদের সচেষ্ট রাখছেন। আদর্শ পাঠকৃতির সংজ্ঞা তাই নির্ধারিত হয় এভাবে—

> 'The ideal text is a galaxy of signifiers, not a structure of signifieds; it has no begining .....we gain ac-

> cess to it by several entrances none of which can be authoritatively declared to be the main one; the codes it mobilizes extend as far as the eye can reach. (রোঁলা বার্ত)[২]

উত্তরায়ণ-মনস্ক উত্তরাধুনিক পাঠকৃতিতে সতর্ক ও সংবেদনশীল পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে বহু প্রবেশদ্বার বর্তমান সময়ের নানা ঘটনা—সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে যে নানা কৌণিকতা তৈরি করেছে তা আখ্যানে রূপায়িত করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই যে আখ্যান হয়ে পড়ে অনেকার্থদ্যোতক ও বহুস্বরসঙ্গতিপূর্ণ। এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায়ের বয়ানে এই প্রক্রিয়াটি ধরা পড়ে এভাবে—

> 'আমরা সময়কে ভাঙতে দেখেছি, টুকরো গ্রন্থিহীন অস্তিত্বে উঠে আসতে দেখেছি, টুকরো হওয়ার প্রক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের জৈব সময়ের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে বিপুল বিশাল একটি সময়ের সঙ্গে একে যুক্ত করতে। তাই এ সময়ের আখ্যানে জনশ্রুতি, লোককাহিনী এবং কল্পকথা বা মিথের ব্যবহার নতুনভাবে দেখা যাচ্ছে। টুকরো সময়ের সঙ্গে মানবসভ্যতার প্রবাহিত সময়ের সংযুক্তিকরণ কি সাহিত্যের নতুন পথের সন্ধান নয়? মিথকে শুধু ব্যবহারের জন্য নয় ভেঙে নতুন সময়ের চরিত্র খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আখ্যান যে জীবন্ত তা প্রমাণ করা যাচ্ছে। উঠে আসছে সময়ের দেহ কোষে সারিবৃদ্ধ মৃত জীবিত কোষেরা এবং নতুন করে জীবন মৃত্যুর খেলা।'[৩]

কোনো যথার্থ উপন্যাসে সময় থাকে বহির্বৃত ও অন্তর্বৃত দুভাবে এবং দুয়েরই কেন্দ্রস্থলে। আর তাই সার্থক উপন্যাসের আখ্যান, চরিত্র নির্মাণ, তাদের মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব তথা সংকট, রচনাশৈলী সবকিছুতেই থাকে সময়ের ছাপ। একটু অন্যভাবে বলা যায়—

> 'সার্থক উপন্যাস তাকেই বলব যেখানে বয়নের সংকটময় সন্ধিমুহূর্ত ও আবর্তন বিন্দু ব্যক্ত হয় সময়ের বিভিন্ন চিহ্নায়কের মধ্য দিয়ে।'[৪]

তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতেই পারে, ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ভাবাদর্শ, দৃষ্টিকোণ, সামাজিক অবস্থান তাঁর সৃষ্টিকর্মকে প্রভাবিত করে। তাই একই সময়ের একজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে যখন দেখি বহুস্বরিক সময়ের বয়ান তখনই অন্য একজন ঔপন্যাসিককে দেখি পণ্যায়নের মায়ায় ভুলে সত্যভ্রম সৃষ্টি

করতে। তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> ‘অর্থাৎ সময় ও পরিসেরর ক্রম নির্ভর ক্রনোটোপের বিন্যাস আখ্যানের পক্ষে আবশ্যিক হলেও সাম্প্রতিক কালের আধিপত্যবাদী কৃৎকৌশল ও ঔপন্যাসিকের প্রতিস্রোতপন্থী জীবনবীক্ষণ আখ্যানবিশ্বের প্রকৃত নিয়ন্তা।’[৫]

তাই এ অধ্যায়ে আলোচ্য সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসদ্বয়ে প্রবেশ কালে তাঁর জীবনবীক্ষণ ও তত্ত্ববিশ্বকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে যাব।

‘সত্তরের ক্রনটোপ জাত লেখক’সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে রাজনীতির উপস্থিতি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৭০ সালে প্রথম উপন্যাস ‘অগ্নিদগ্ধ’ প্রকাশিত হয়—পটভূমি ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন। পরবর্তী ‘গহীন গাঙ’ ‘দুই ঠিকানা’ ‘উদ্যোগ পর্ব’ ‘পিতৃভূমি’ ‘পক্ষবিপক্ষ’ ‘জল তিমির’ ‘মাটির অ্যান্টেনা’ ‘ধরিত্রী’ ‘তেঁতুলপাতার ঝোল’—তাঁর এ সব কটি উপন্যাসই সামাজিক সময় ধরার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সময়কেও ছুঁয়ে যায়। তিনি নিজে একটি সাক্ষাৎকারে জানান—

> আমরা তৃতীয় দুনিয়ার লোক, আমরা কিন্তু রাজনীতিকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্যের কথা ভাবতে পারি না।’[৬]

‘নন্দন’ এর মতো একটি নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচারক পত্রিকার প্রথম লেখালেখির কাজ শুরু করলেও লেখক হিসেবে তারপর তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। সেই যাত্রার উপলব্ধি তাঁর নিজস্ব বয়ানে—

> ‘...চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পে আমার কথা, কোনো দলের ফরম্যান সরাসরি জানিয়ে দেয়াটা ঠিক নয় জীবন্ত শক্তি (Life force) কে যথাযথ তুলে এনে পাঠককে জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝিয়ে দেয়াই যথার্থ সাহিত্য...।’[৭]

তিনি আরো বলেন—

> ‘এক সময় আমাদের মনে হত, কারও ম্যানিফেস্টো বা বক্তব্যকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করাই সাহিত্যের দায়বদ্ধতা। কিন্তু আমাদের আরও ব্যাপক, ব্যাপ্ত জায়গায় যেতে হবে। সাহিত্যের কোনও দায়বদ্ধতা নেই তাও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু দায়বদ্ধতা হল শক্তি নিঃসরণের স্বপ্ন তৈরি করার।’[৮]

নিরপেক্ষতার মুখোশ ব্যবহার রাজনীতি মনস্ক এই সৎ কথাকার কখনোই করেন না। বরং বিশ্বাস করেন—

> আজ আর ব্যক্তি বনাম দল বা প্রতিষ্ঠান নয়, গোষ্ঠী বনাম গোষ্ঠী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত জরাজীর্ণ হতে থাকবে, নতুন কোনও সামাজিক ব্যবস্থা বিকল্প হবে না যতদিন, গোষ্ঠী সংগ্রাম রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন ক্ষমতার কেন্দ্রে তীব্র হবে। ব্যক্তি থাকবে গোষ্ঠীর উপগ্রহ হয়ে। এর বলয়ে অবশ্যই থাকবে সম্পর্ক ভালোবাসা মূল্যবোধ ইত্যাদি। কারণ এগুলো ব্যক্তির । তাই সময়কে বুঝতে গেলে সঠিক প্রেক্ষিতে ধরতে গেলে মহৎ রাজনৈতিক উপন্যাস না লিখে উপায় নেই।'[৯]

লেখা বা কথাসাহিত্য নির্মাণ যে কথাকারের কাছে 'একটি সামাজিক দায়িত্ব'—কেবল নেশা বা পেশা নয়—তাঁর রচনা যে পাঠককে শিক্ষিত করে ও শিক্ষার বি-নির্মাণও ঘটাবে সে কথা বলাবাহুল্য। তাঁর প্রত্যেকটি আখ্যানই তাই জীবনভাবনা রাজনীতিসচেতনতা, সময় ও সমাজ জিজ্ঞাসার আশ্চর্য মেলবন্ধন। পুনর্নবায়ন তাঁর বৈশিষ্ট্য। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের আঁচ থেকে জন্মান 'অগ্নিদগ্ধ'-এর একমুখিনতায় তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলি আর আবদ্ধ থাকেনি। কারণ লেখক বিশ্বাস করেন—

> 'জীবন তার সম্ভাবনাময় যে কোনো লক্ষ্যের পথ খুঁজে নিতে পারে এমনকী কম সম্ভাবনাময় পথেও হেঁটে যাবে—সব কিছুর ইঙ্গিত আখ্যানের গভীরে গচ্ছিত থাকুক।'[১০]

'জলতিমির' (১৯৯৮) সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সেই 'সব কিছুর ইঙ্গিত'কে আত্মস্থ করে এক বহুমাত্রিক, বহুরৈখিক উপন্যাস। তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—'পরিবেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ক উপন্যাস।' উপন্যাসটি সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আখ্যান শিল্প নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার আশ্চর্য নিদর্শন। বিষয়ের দিক থেকে গেলে এতে রয়েছে ভোগবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অজগর গ্রাসে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাওয়া আধা সামন্তবাদী ও আধা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ভারতের একেবারে অন্দরমহল গ্রামগুলির দৈনন্দিন বাস্তব, প্রান্তিকায়িত মানুষের অজ্ঞতা— অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন-স্বপ্ন ভঙ্গ আর বিভিন্ন মিথ। আর আঙ্গিকের দিক থেকে দেখি এতে প্রবন্ধ, সাংবাদিক প্রতিবেদনের ধরনটির ঔপন্যাসিকরণ হচ্ছে। ডকুমেন্টের আকারে উঠে আসছে আর্সেনিক সংক্রান্ত বিষয়াবলী। এই ধরণটি একেবারেই নতুন। তাই 'পক্ষবিপক্ষ', 'জলতিমির' ও 'মাটির অ্যান্টেনা' সাধনের এই তিনটি উপন্যাস যখন এক মলাটে 'তিনটি উপন্যাস, নামে প্রকাশিত হয়, তখন প্রকাশক জানান—

> '...বিগত ২৫ বছরে পশ্চিমবাংলার গ্রামচরিত্রের গুণগত পরিবর্তন—অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি, সব মাত্রাতেই। কট্টর উন্মাদ বা সংকীর্ণ ঠুলি পরে না থাকলে

স্বীকার করতেই হয় মানিক-বিভূতি-তারাশঙ্করের গ্রাম ও গ্রামভিত্তিক সামাজিক চৈতন্যের অস্তিত্ব আজ অনেকটাই আর নেই। ভূমি সংস্কার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রযুক্তি সার— বীজ-জলসেচের বল দৃষ্টি ভঙ্গি এবং অতীতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেশের সর্ব অঞ্চল জুড়ে একক বাজারের সঙ্গে আজ পশ্চিম বাংলাও যুক্ত। আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলও সেটেলাইট চ্যানেলে যুক্ত হয়ে গেছে। সমাজ বিন্যাসের নিম্নতম কুঁড়ে-তেও বিকৃত ও ছাটকাট পোষাকে ভোগ্যপণ্য উঁকি দিচ্ছে। ক্ষমতার তৃণমূলী ব্যবহারের সুফল ও বিকৃতি, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুনীতি বা স্বচ্ছতা—যাই থাকুক না কেন—পরিবর্তন অস্বীকার করা যাবে না। শিক্ষা, উন্নয়ন, কৃষিপ্রযুক্তি, নারীমুক্তি থেকে স্বাস্থ্য, পরমায়ু, সংস্কৃতি, পরিবেশ মনস্কতা—সব ক্ষেত্রেই আজ গ্রাম চৈতন্য নানা সংঘাতে অস্থির । সেসবেরই প্রতিফলন আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে নবরূপ লাভ করেছে।'[১১]

দুই

গ্রামীণ পৌরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের আন্তঃক্রিয়া ও আততির সার্থক প্রতিবেদন হিসেবে 'জলতিমির' অনবদ্য। ব্যক্তি অন্নপূর্ণার জীবন মৃত্যুর কথকতার সূক্ষ সূত্রে গ্রথিত আখ্যানটি মূলত ব্যক্ত করে কীভাবে প্রান্তিকায়িত মানুষের জীবনের গভীরে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রতাপের কৃৎকৌশল তার শিকড় প্রোথিত করে। উপন্যাসটির পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের এক অখ্যাত গ্রাম। সেই গ্রামের এক নিম্নবিত্ত সাধারণ পরিবারের এক অতি সাধারণ নারী অন্নপূর্ণার মৃত্যুতে উপন্যাসের প্রারম্ভ এবং ঘটনাটিকে কেন্দ্রে রেখে এগিয়ে পিছিয়ে বোনা হয়েছে উপন্যাসের জমি। কারণ সাধন চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন—

> 'আমাদের তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যে গল্প একটি থাকতেই হবে। তবে কাহিনীরেখাটিকে কে কত সূক্ষ করে নিতে পারেন কিংবা বয়ন পদ্ধতি কার কতখানি মজবুত হবে, সে পরীক্ষা যার যার তার তার।'[১২]

আর যেহেতু ব্যক্তি জীবনের কাহিনিকে অন্তর্বয়ন হিসেবে ব্যবহার করেও কথাকারের মূল উদ্দেশ্য হয় সময় ও সমাজ প্রেক্ষিত উন্মোচন তাই অন্নপূর্ণার কাহিনিতেই উপন্যাস শেষ হয়ে যায় না। লেখকের ভাষায়—

> ‘আমার কথাটি ফুরল। নটে গাছটি মুড়ল। কিন্তু পৃথিবীতে কথা ফুরায় না, নটে গাছাটিও মুড়ায় না। বার বার বীজ হয়ে ফিরে আসে। সেই বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে বীজ—এই ভাবে চক্রাকারে।’[১৩]

মন বা কল্পনার স্বাধীন সত্তাটুকুকে সম্মান জানিয়ে লেখক যা তৈরি করেন তার ‘শুরু শেষ মিশে’ যায় ‘ব্যাপ্ত কাল খণ্ড ও স্পেসের মধ্যে।’ (পৃ.১৬/অক্ষরের বদ্ধজীবন)। আখ্যানটির স্তরে স্তরে উঠে আসে এই সময়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পরিসরে দলীয় রাজনীতির সংঘাত, চেতনার পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে থাকে অপরিবর্তনের উপল খণ্ড, কুৎসিৎ স্বার্থপরতা, তৃতীয় বিশ্বের পরিসরে নয়া উপনিবেশবাদের করাল ছায়া, অন্যদিকে অপুষ্টি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পেটেন্ট সমস্যা, প্রথম বিশ্বের শোষকের ভূমিকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর এই প্রসঙ্গে উঠে আসে বিভিন্ন চরিত্র—পরাণ , অন্নপূর্ণা, ফুল্লরা, দীনা ফকির , পঞ্চানন, মালতী, রেবা, শ্যামা, অনুকূল, শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না, আশিষ, শুভদীপ, অভয়ঙ্কর চৌধুরী, সুচারু সান্যাল, বনমালী বিশ্বাস, হিমাংশু মণ্ডল, ফেদু মল্লিক, কার্তিক কুণ্ডু ও আরো অনেক। লেখকের এই স্তর থেকে স্তরান্তর যাত্রা খুবই সাবলীল স্বচ্ছন্দ। কারণ লেখক এই সময়কে যথার্থ অনুধাবন করেছেন। তিনি জানেন এখন—

> ‘Time here appears in the mask...which threatens, denies wishes, suppresses and expropriates them. It is the mark of time which causes sufferings and which has inevitable death in stare in the end-Time is made by human beings and has to do with power which they exercise over one another with the aid of strategies of time. Time unites and separates combatants as well as lovers. As with every form of power, there is a counterpower,every strategy finds its counter strategy, [১৪]

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উপনিবেশবাদ ও আধুনিকবাদ রক্তবীজের মতো একবার ধ্বংস হয়েও আবার জেগে উঠছে। নয়া উপনিবেশবাদ, বিশ্বপুঁজিবাদ চালাচ্ছে উপগ্রহ প্রযুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক

আগ্রাসন। তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তবর্তী গ্রামগুলিতেও পৌঁছে যাচ্ছে তার ছায়া। পরিবর্তন যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছিল তা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল প্রায় যেমন শিক্ষার ক্ষেত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি। অন্যদিকে পরিবর্তন এল বাড়িতে বাড়িতে বোকাবাক্স, ডিস অ্যান্টেনা, আর কেবল কানেকসনের হাত ধরে চুল আর কাপড়ের ছাঁটকাটে, চলচ্চিত্রের গানে আর ভোগ্যপণ্যের অতৃপ্ত চাহিদায়। রণজিৎ দাশগুপ্ত 'স্বাধীনতার পাঁচ দশকে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি' নামক একটি প্রবন্ধে এই অবস্থাটাকে বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে—

> '...পরিবর্তনের ধারায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে দারিদ্র্য এবং কর্মহীনতাও। আশির দশকের মাঝামাঝিতে এই বৈশিষ্ট্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক উন্নতি যা হয়েছে তার ফল ভোগ করছে অতি ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী, আর অসংখ্য মানুষ রয়েছে অন্ধকারে। সংখ্যাগত দিকটা দেখা দরকার। দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা ও হিসেব নিয়ে অনেক তর্ক রয়েছে। তবে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ অনুসারে দারিদ্র্যসীমার নিচের সংখ্যার অনুপাত ১৯৭০-৭১-এ ছিল ৫৬.২৫ শতাংশ, ১৯৮৭-৮৮-তে এটা কমে হয় ৪৫.৮৫ শতাংশ কিন্তু প্রথমোক্ত বছরটিতে মোট দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ৩০ কোটি, শেষোক্ত বছরে এটি বেড়ে হয় ৩৬ কোটি (উৎসঃ বি. এস. মিনহাস ও অন্যান্য, 'ডিক্লাইনিং ইন্সিডেন্স অব পভার্টি ইন দ্য নাইনটিন এইটিজ—এভিডেন্স ভার্সাস আর্টিফ্যাক্টস, 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুস ২৬, সংখ্যা ২৭.২৮, ১৯৯১)।
>
> অবস্থাটা অন্যভাবেও বলা যায়। ৮ কি ১০ শতাংশ মানুষের—ভারতের মতো জনবহুল দেশে তার সংখ্যা ৭/৮ কোটির কম নয়—জন্য চোখ ধাঁধানো বিলাস বৈভব, আর অগণিত মানুষের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্দশা ও কর্মহীনতা। পাঁচতারা হোটেল, আর কাছেই নোংরা ঘিঞ্জি দরিদ্রতম বস্তি। রকমারি নজরকাড়া বস্ত্রসম্ভারের পাশাপাশি জনসাধারণের একান্ত বস্ত্রাভাব। ফুড কর্পোরেশনের গুদামে খাদ্যসাম্যের বিপুল মজুত ও বিত্তবানদের তাতে খাদ্যের বিপুল অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহার ও অপুষ্টি। এদিকে শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের এক বৃহৎ অংশ অর্থাৎ সচরাচর যাদের—অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বলে গণ্য করা হয় তাদের কাজ এবং মজুরির কোনো নিরাপত্তাই ছিল না, তাদের জন্য বোনাস, পি. এফ ইত্যাদি আইনের কোনো মানেই ছিল না।'[১৫]

সময়ের এই আখ্যানকে সাধন তোলে আনেন 'জলতিমির'-এর মতো আখ্যানে। যখন আখ্যানকার

আখ্যানের নামকরণ করেন 'জলতিমির' তখন সেখানেও থাকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতেই পারে জাক দেরিদার মন্তব্য। তাঁর মতে নাম প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুতি আর সেজন্যে তা হল বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক বিন্দু। আখ্যানের এই নামটিতে কেবল জলের আর্সেনিক দূষণ নয়, ধরা পড়ে জীবনের অন্ধকার—জীবনে অজ্ঞতার, অশিক্ষার, দারিদ্র্যের শোষণের , চিন্তার জীবনবোধের অন্ধকার। এ সময়ের অগ্রণী সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> 'বিদূষণ ও বিকার ঘটিয়ে চলেছে যে আর্সেনিক, তা আসলে চিহ্নায়ক রূপকে বাস্তবতা। সাধন আমাদের অভ্যাস— জর্জরিত রূদ্ধ সৃষ্টির অর্গল খুলে দিতে চান। দেখাতে চান, নিম্নবর্গীয় জনেরাও নয়া ঔপনিবেশিক জালে বদ্ধ ক্রমবর্ধমান ভোগবাদের কাছে তথাকথিত রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক আন্দোলনগুলি ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে।'[১৬]

পশ্চিমবাংলার এক প্রান্তিক গ্রামের প্রান্তিকায়িত মানুষের জীবনের স্বপ্ন, ভ্রান্তি, কুসংস্কার—বিশ্বাস, মিথ নিয়ে গড়ে ওঠে সাধনের ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। তাই আখ্যানের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম হয় 'স্বপ্নের সোনা ও যমুনার বাঁশি'। যে অধ্যায় শুরুই হয় এক মৃত্যুর খবর শুনিয়ে। লেখক কথকের আঙরাখা গায়ে চাপিয়ে এক পরা-গ্রহীতাকে সম্বোধন করে জানাতে থাকেন মৃত্যুর আগের ঘটনাবলী। উন্মোচিত হয় দিন এনে দিন খাওয়া নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোর যাপিত দিন রাত্রি। তাদের ছোট খাটো স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখে অন্নপূর্ণা সোনা পাওয়ার পর পর তিনরাত। সোনা সম্বন্ধে তার ধারণা আলোছায়া। তার মা ফুল্লরা সোনার সঙ্গে জড়িয়ে দেয় সুখের ধারনা—

> '...রাণী এলিজাবেথের কত সুখ! রোজ সোনার ডাবরে দাওয়া লেপে! যেমন খুশি ব্যবহার করলেও ডাবর ভাঙে না।'[১৭]

নিজের জীবন সম্ভবত মানুষের কল্পনাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত নিরক্ষর , বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগহীন মানুষের কল্পনাকে। তাই ফুল্লরার কল্পনায় মহারাণীর দাওয়া লেপার ছবিই আসে। কেবল তার নিজের সঙ্গে পার্থক্য রাণী সোনার ডাবরে দাওয়া লেপে—তা কখনই ভাঙে না।

এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক তথা তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য এর মধ্যে কার্নিভালের প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন। তার মতে—

> 'এখানে যেন বাখতিন কথিত 'folk carnival humour'এর চমৎকার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি যার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে 'boundless world of humourous

forms and manifestations (which) opposed the official and serious tone'! ফলে আমাদের কাছে উন্মোচিত হলো ঔপন্যাসিকতারও অচেনা ধরন যেখানে আপাত কৌতুক বিস্ফোরকের মতো পাথরের স্তর বিদীর্ণ করে এনে দেয় প্রচ্ছন্ন জলস্তর। আসলে বাচনের এই বিশেষ প্রয়োগে বিধৃত হয়েছে সাধনের প্রতিবাদ ; এই প্রতিবাদ মূলত প্রতাপ লালিত ঔপন্যাসিক আকরণের বিরুদ্ধে। এতে কাহিনী আরো গতিময় হলো কিনা, বর্ণিত কুশীলবেরা আরো উজ্জ্বল কিংবা গ্রন্থিল হলো কিনা—এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি চিরাগত নিচু তলাকেও মনোযোগের বিষয় করে তুলছে, এই বার্তাই গুরুত্বপূর্ণ। খাঁটি কানির্ভালের চেতনা অপ্রত্যাশিত বস্তুসম্বন্ধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ; যেমন রাণী এলিজাবেথ রোজ সোনার ডাবরে দাওয়া লেপে। এই চেতনা আপাত বিপরীতকে মেলায় কেবল বাহ্যত, আসলে অনালোকিত ও হতমান অস্তিত্বকেই প্রকট করে তোলে। সুয়ে ভাইস লিখেছেনঙ্খ 'Canival mesalliances allow for unusual combinatios; the sacred with the profane the lofty with the low, the great with the insignificant, the wise with the stupid.' সাধন এখানে প্রাগুক্ত 'folk carnival humour' এর মধ্য দিয়ে প্রতিবেদনের সম্ভাব্য বিকল্পকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।'[১৮]

নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলি যেমন দেখেনি সোনা, তেমনি তাদের ধারণা নেই রাজবাড়ি সম্বন্ধে। গ্রামের বাইরের বৃহৎ পৃথিবী সম্বন্ধে। তাদের এই অজ্ঞতাকে লেখক উন্মোচিত করেন এভাবে—

'...ও জানত না সুর্যটা স্থির, পৃথিবী ঘুরছে। উল্টো ধারনাই ছিল কারণ ছোটবেলা থেকে আকাশ বেয়ে সূর্য ওঠে, এটাই দুচোখ ভরে দেখার অভ্যেস । জানত না চাঁদ কোনও দাহ্য বস্তু নয়। বহুদিন ধরে বিশ্বাস করে এসেছিল এরোপ্লেন থেকে ভুলে,হাত ফসকে দু-একটা বাক্স প্যাঁটরা ওই ধানমাঠটায় পড়তে পারে। সমুদ্র মানে ম-স্ত বড় পুকুর। এই 'ম-স্ত' শব্দটি যে কী আকারের অসীম কোনও দিন আন্দাজ করতে পারেনি। ও আমৃত্যু জানতেই পারেনি ওয়াশিংটন বলে কোন শহর আছে জগতে যেখানে হোয়াইট হাউস নামক একটি রাজপ্রসাদে ধবধবে চামড়া ও তামাটে বর্ণের চুল নিয়ে ক্লিন্টন দেশ চালায়। ও নাম শোনেনি মেধা পাঠেকর বা বাবা আমতের। [১৯]

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়েও গ্রাম বাংলার অবস্থা এমনতর যেখানে জন্ডিসের চিকিৎসা হয় ঝাঁড়ফুক আর যৎসামান্য ভেষজে। অন্যান্য রোগের জন্যেও ভরসা হোমিওপ্যাথ। এসবে রোগী বাঁচলে বাঁচল নিজের আয়ুর জোরে আর নয়ত 'পট করে মরে যাওয়া।' তবে পরিবর্তন হচ্ছে ধীরে ধীরে দিন বদলাচ্ছে! লেখকের এই উচ্চারণে কেমন যেন ব্যঙ্গই ঝরে পড়ে। কারণ এর খানিক আগেই লেখক আমাদের জানিয়ে দেন সরকারি হাসপাতালের হালহকিকৎ। যেখানে বারান্দায় পড়ে থাকা রোগীর 'পিঠে কুকুরে মুতে' দেয়। হাসপাতাল যে সব গ্রাম থেকে আট মাইল দূরে আর যান বলতে 'দুই বাঁশের দড়ির দোলনা' যার বাহক মানুষ, সেই গ্রামের লোকেরা যে ভাগ্যের হাতে জীবন মৃত্যু ছেড়ে বসে থাকবে নয়তো দীনা বা কদম ফকিরের সাহায্য নেবে সে আর বড়ো কথা কি? এ সব অঞ্চলের উন্নতির চেষ্টা যা হয় তা নগণ্য। কারণ এই অঞ্চলে লোকেরা ব্যক্তিগত ঝগড়া বিবাদের ফলে কখনো একজোট হতে পারে না। আর শাসক দলও তাই মাথা ঘামায় না। কারণ এই ঝগড়া বিবাদের ফলে সবসময়ই ভোট ভাগ হয়ে যায় আধাআধি। অর্ধেক এ দল তো অর্ধেক সে দল। লেখকের ভাষায়—

> '২৫/২৬ ঘরের অদ্দেক কংগ্রেস , অদ্দেক সি পি এম। তাই সর্দার পাড়া নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না!'[২০]

আর নিজেদের মধ্যে থাকা এই বিভাজন যে সবসময়ই কোনো না কোনোভাবে নিজেদেরই ক্ষতি করে তা তো চিরন্তন সত্য। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ানোর এই অক্ষমতাকে লেখক বিস্তৃত করে আমাদের সামনে তোলে ধরেন মিথকে সাঙ্গীকৃত করে। গরুড়ের সর্পকুল ধ্বংসের বিরুদ্ধে কালীয় প্রথমেই কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কারণ—

'নিম্নবর্গের কালীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও সূক্ষ নানা ভাগ উপভাগ ছিল। 'আধুনিক ভাষায় বলা হয়' ক্রিমি লেয়ার।

> এই ব্রাত্যদের মধ্যেও পারস্পরিক অনেক তারতম্য। অর্থের প্রতাপের এবং ভুসম্পত্তির। গরুড়ের নির্দেশে যারা খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিল প্রতিদিন, তাদের আকুতি, ক্রন্দন বা বিলাপে কালীয় তেমন সংবেদনশীল ছিল না। শুনেও শোনে না, দেখেও দেখে না—কিছুটা কূটনৈতিক সহানুভূতি মতো।.....অবশেষ সেই অলাতচক্রের ছোঁয়া ক্রমে কালীঘর নিকটপরিজন, বন্ধুবান্ধব বা ঘনিষ্টদের সংসারে তাপ সৃষ্টি করতেই বোঝা গেল আর বাঁচার উপায় নেই। দেওয়ালে পিঠ। যেমন করেই হোক এই প্রথার ছেদ টানতে হবে। বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে কালীয় ফরমান জারি করল, কাউকে আর গরুড়ের কাছে পাঠানো চলবে না।'[২১]

তিন

আর্সেনিকের যে প্রদূষণ সমস্যা এই অঞ্চলের মানুষগুলির সমানে নিয়তির নিষ্ঠুরতম চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাও একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে আসা কিছু পরিবর্তন আর কিছু অপরিবর্তনের ফল যেন বা। বিজ্ঞান প্রযুক্তির জয়ধ্বজা হিসেবে চাষে অপরিণামদর্শীর মতো ব্যবহার হচ্ছে রাসায়নিক সার, ভূগর্ভস্থ জল তুলে এনে চলছে সেচকার্য। এরই প্রতিক্রিয়া জলের আর্সেনিক দূষণ। আবার এই রাসায়নিক বিষক্রিয়া যাদের উপর দ্রুত কাজ করে তারা হল অপুষ্টিতে ভোগা গ্রামের সাধারণ জনগণ। যাদের অবস্থা এক ক্ষেতমজুর এর লৌকিক ভাষায়—

> ‘পেষ্টোকার খাদ্য পাবো কৈ মোরা ?.......যা বাজার, এট্টু গুড় কিনতি গেলি পোঁদের কাপড় খুলি যায়।’[২২]

আর শিক্ষিত মানুষের মার্জিত ভাষায়—

> ‘আর্সেনিক আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সুষম খাদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ...এ থেকে বোঝা যায় গরিবি হটাও ফটাও স্রেফ ধাপ্পা, গ্রামের আর্থিক অবস্থা আর্সেনিক দূষণ থেকেই ধরা যায়।’[২৩]

আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে গ্রামের মানুষগুলো বোধও যৎসামান্য। পুকুরের জলও বিষিয়ে উঠছে মানুষের বর্জ্যপদার্থ ধৌত জলের স্পর্শে। কারণ মলসূত্র ত্যাগের বিজ্ঞানসম্মত কোনো স্থান তাদের কাছে উপলব্ধ নয়। নিজেদেরও তাদের কোনো চেষ্টা নেই এ সম্বন্ধে। জলে ফিটকিরি ব্যবহারের খরচটুকুও প্রায় সকলে করতে নারাজ। অপুষ্টিতে পীড়িত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণাহীন এই ভারতবর্ষের কৃষকদের প্রধান সমস্যা তো মূলত আর্থিক। এ তো কেবল পশ্চিমবঙ্গের চেহারা নয়, এ মুখ সর্বভারতীয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে উত্থিত অমৃতটুকু পান করে কার্তিক কুণ্ডুর মতো লোকেরা। তাই জনজাগরণি মূলক অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করে তারা। আখ্যানে কার্তিক কুণ্ডু এই মুনাফাভোগী শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে বলে—

> ‘আমরা এমনিতেই গরীব মুখ্যু মানুষ... হাজার যন্ত্রণায় আছি... ফালতু জল নিয়ে ভয় পাইয়ে দেবেন না।... স্যালোয় চাষ চলবে, হাইব্রিড এবং সার লাগবেই... গাঁয়ের মানুষ তো আঁটি চুষবে না।’[২৪]

আর্থ সামাজিক এই পরিস্থিতিতেও তবু কোনো কোনো ব্যক্তি তার সীমিত ক্ষমতায় প্রতিরোধ গড়ার

চেষ্টা করে। অন্নপূর্ণার মতো তথাকথিত গ্রাম্য গৃহবধূ তার সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝতে পারে অত্যধিক কীটনাশক আখেরে সমস্যার সৃষ্টি করে, তার সন্দেহ জাগে কেন গ্রামের ঘরে ঘরে বারোমাস সর্দি, পেট খারাপ, ত্বকের অসুস্থতা লেগে আছে। সে যখন জলের আর্সেনিকের কথা জানতে পারে তখন পাড়ার অন্যান্য মানুষের মতো নিয়তি বা ভাগ্যের হাতে জীবন মৃত্যু ভেবে বসে থাকে না। সে ফিটকিরি ব্যবহার করেছে, ফিল্টার ব্যবহার করেছে। সে ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর সময় সস্তাদরের একটি জলের বোতল ঝুলিয়ে দেয় কাঁধে। কিন্তু ব্যক্তির এই সামান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজে আসে না। সে মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। কারণ 'ভূগর্ভের জল থেকে শুরু করে আকাশ বাতাস শস্যের দানার মধ্যে প্রবেশ করে বিষ ছড়াচ্ছে' (পৃ.১২১) আজকের কালীয় রূপী সময়-রাষ্ট্র-সমাজ। সে জানত পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। কিন্তু সে জানত না একজন মানুষের জন্যে ঠিক কতটুকু পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এছাড়া সামান্য আয়ে পরিবারের সকলের জন্যে সুষমখাদ্যের যোগান দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই তার বাঁচার প্রত্যয় মিথ্যা হয়ে যায়। অসুস্থ অন্নপূর্ণা তড়কায় দেখে—

> 'আদিগন্ত মাঠ জ্বলছে খরায়। প্রতিটি ফাটলের রন্ধ্রপথে তপ্ত বাষ্প কুটিল ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে আকাশে ছেয়ে ফেলেছে। তারই ওপাশে রক্তবর্ণ তামাটে সূর্যটা আচ্ছন্ন। এবং অন্নপূর্ণার বড় ছেলেটা বলা কওয়া নেই একছুটে ওই মাঠের মধ্যে যায় এবং আর ফিরে আসতে পারে না। কে যেন গ্রাস করে তাকে।'[২৫]

অসুস্থতার ঘোরে দেখা এ স্বপ্ন তো বাস্তবপ্রায়। অনবরত পরিবেশ পৃথিবীকে যেভাবে ধ্বস্ত করা হচ্ছে এ সময়ে বর্তমানের লোভ আকাঙ্খা পূরণের জন্যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে তো রয়ে যাচ্ছে এক ছিবড়ে পৃথিবী, বন্ধ্যা ঊষর পৃথিবী। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা আর উচ্চ ও মধ্যবিত্তের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পূরণ করতে করতে ক্লান্ত রিক্তপ্রায় ধরিত্রী বিষ ওগরাচ্ছে—আর জনস্বাস্থ্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ন্যূনতম জ্ঞানহীন দরিদ্র জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে সেই বিশেষে।

আবার অর্থ ও বর্ণ বৈষম্যের শিকার এই প্রান্তিকায়িত গ্রামবাসীদের মৃত্যু মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের কাছে নিছক পরিসংখ্যান মাত্র আবার কখনো নিজেদের উন্নতির পথ—সমাজসেবা দরিদ্রসেবার নাম করে নিজেদের আখের গোছানো। অভয়ঙ্কর চক্রবর্তী, যাঁর তৎপরতায় আর্সেনিকের এই প্রদূষণ জনসমক্ষে উঠে আসে, সরকারের ভাবনা চিন্তার বৃত্তে প্রবেশ করে, তাঁর কাজের পেছনে দেখি নিজস্ব স্বার্থের ছায়া। স্বআবিষ্কৃত ফিল্টারের প্রচার ও গবেষণার সুবিধা তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের জন্যেই তাঁর সকল কর্মতৎপরতা। আর এ ধরনের চরিত্র মোটেও আকাশ থেকে পেড়ে আনা নয়। আমাদের বর্তমান সময় ও সমাজ লালিত এই চরিত্রটির নির্মাণ বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। 'কেন উপন্যাস লিখি' নামক একটি প্রবন্ধে সাধন

চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—

> 'যাদুবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দীপঙ্কর চক্রবর্তী তখন বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় করছেন। নানা বিদেশী দল নিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন। চাষিদের মধ্যে পরিশ্রুত জলের জন্য ফিল্টার কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন। পরে শুনেছি, নিজেরই ফিল্টারের ব্যবসা আছে।'[২৬]

শুভদীপও তেমনি বাণীতলা বিজ্ঞান মঞ্চকে ব্যবহার করে সে পৌঁছেছে অভয়ঙ্কর চক্রবর্তী কাছে, আর সেখান থেকে সে পাকা করেছে ঢাকা ও অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথ।

আর বিশ্বায়নের বাজারে উন্নতদেশগুলির বেনিয়াগোষ্ঠী তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের প্রচেষ্টার সাধু, সংকল্পের আড়ালে শুরু করে দরিদ্র অশিক্ষিত এই লোকগুলির জীবন মৃত্যুর বেসাতি। সুচারু স্যানালকে মুখপাত্র করে লেখক প্রথম বিশ্বের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এই ধূর্ততা ও কৃৎকৌশলকে পাঠকের কাছে তোলে ধরেন। নিবন্ধের রচনাভঙ্গি সংযোজিত হয় আখ্যানে। ওঠে আসে অপুষ্টির ফলে মৃত শিশুর পরিসংখ্যান থেকে শুরু করে সবকিছুকে বেসরকারীকরণের কুফল এবং সব শেষে পেটেন্টের বিষয়টি। কারন—

> 'আর্সেনিক, কৃষি, বীজ, খাদ্যভ্যাস থেকে শুরু করে তেল, সার ও কৃষি বিজ্ঞানকে পেটেন্ট চালু করার পর টোটাল আউটলুকে দেখতে হবে। আর্সেনিক সমস্যা আছে কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।'[২৭]

চার

পশ্চিমবাংলা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের তুলনায় সংস্কৃতি সচেতন রাজনীতি সচেতন রাজ্য হিসেবে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে এমন বাঙালি সন্তান পাওয়া প্রায় অসম্ভব যে কোনো এক বয়সে রাজনীতি এবং কবিতা চর্চা করেনি। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও রাজনীতি সচেতন বাঙালির আন্দোলন থেমে থাকেনি। আধিপত্য ও প্রতাপের বিরুদ্ধে সে লড়াই চালিয়ে গেছে স্বাধিকার লাভের জন্য।অবশেষে ৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও অপারেশন বর্গার মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সরষের ভেতরে যদি ভূত রয়ে যায় তবে ভূত তাড়ানো যেমন অসম্ভব, তেমনি

সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী দলের ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্রের ঘূণ ধরে গেলে শ্রেণীসংগ্রাম বজায় রাখা অসম্ভব। আসলে দীর্ঘদিনের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা যাদের স্বার্থরক্ষার উপায় তারা কিছুতেই কায়েমি অবস্থার অবসান হতে দিতে চায় না —

> ‘গ্রামীণ পৌরসমাজের নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠনের আয়োজনে অন্তর্ঘাত করার জন্য এরা নতুন রণকৌশল গ্রহণ করে। প্রতিবাদী শক্তির নমনীয় অংশের সঙ্গে ধীরে ধীরে গাঁটছড়া বাঁধে তাদের রাজনৈতিক বোধের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। কিছুদিন পরে এরাই হয়তো গ্রামীণ পৌরসমাজের নতুন মেরুকরণের প্রক্রিয়ায় সহযোগী শক্তির ভূমিকা নেওয়ার ভান করে।’[১৮]

তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে পরিবর্তন অনস্বীকার্যভাবে পশ্চিমবঙ্গে উজ্জ্বল এক ছবি তৈরি করেছিল তার একটা উল্টো অন্ধকার দিকও তৈরি হল। বিশেষজ্ঞরা এ অসম্পূর্ণতার প্রধান দুটি দিক তুলে ধরেন।

> ‘দুই প্রধান বিতর্কের কেন্দ্র, আজকের দিন এ রাজ্যে বর্গাদারের অবস্থা ও বিভাজন আর বর্গাদার বনাম কৃষিশ্রমিক। কারোর কারোর মতে, ভাগচাষীরাও সবাই এক পর্যায়ের নয়। তাদের মধ্যেও বড় ছোট অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ও দরিদ্র মানুষ আছে। সাধারণভাবে বড় ভাগচাষীরাই বর্গা রেকর্ড করেছে কারণ মালিকদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অধিক। যেখানে সব ধরনের বর্গাদার নাম রেকর্ড করিয়েছে সেখানেও আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণ (institutional credit) ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধালাভের ব্যাপারে বড় বর্গাদাররা স্বাভাবিকভাবেই অগ্রণী। ফলে গত দুই দশকে বর্গাদারদের মধ্যে এক ধরনের বিভাজন রেখা ফুটে উঠেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বড় বর্গাদাররা মধ্য চাষীতে পরিণত হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এরা যে কেবল বড় চাষী বা জোতদারের জমি ভাগে চাষ করে তা নয়, কোথাও কোথাও নিজেদের চেয়ে ছোট চাষীর জমিও ভাগে দিতে দ্বিধা করে না। এ ভাবে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এক নতুন এলিট ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। এই এলিট অবশ্যই প্রাক্ ১৯৭৭ পল্লীসমাজের কর্তাদের তুলনায় অনেক কম ধনী। মাটির বেশ কাছাকাছি। তাদের কৃষক পরিচয় মুছে যায়নি।...
>
> এই বিভাজনের সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে জাতপাত বা আদিবাসী সমস্যা।

আমরা দেখিছি, অন্য রাজ্যের তুলনায় এমন প্রশ্ন এ রাজ্যের রাজনীতিতে তেমন প্রত্যক্ষভাবে আসেনি। তবে পর্দার আড়ালে জাত বা উপজাতি বস্তুটির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এ কথা ভাবলে ভুল হবে।... পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে নিম্নবর্ণ ও আদিবাসীদের সংখ্যা এখনো বেশি।...

দ্বিতীয়ত আসে ক্ষেতমজুরদের প্রশ্ন।... প্রয়াত বামপন্থী অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্রের মতে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বর্গাদারদের তুলনায় কৃষি শ্রমিকরা সংখ্যাগুরু। কিন্তু তাদের স্বার্থ অপেক্ষাকৃত অবহেলিত হয়েছে।

আরও দেখছি যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের চাষীরাও বেশ অধিক পরিমাণেই ক্ষেতমজুরদের শ্রমের ব্যবহার করে থাকে।...যার ফলে তাদের সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের সম্পর্কটা দ্বন্দ্ব মূলক। ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির জন্যে আন্দোলনে থাকতে যে কোনো পার্টিরই অসুবিধা হয় এই কারণে যে তার দরুণ মধ্য ও ধনী চাষীদের সমর্থন হারাবার ভয় থাকে। ক্ষেতমজুরদের মজুরি বাড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু বৃহত্তম জমির মালিকেরা নয়, শুধু জোতদারেরা ও ধনী কৃষকেরা নয়, অনেক মধ্যচাষী ও এমন কি অনেক ক্ষুদ্র চাষীও। এদের সমর্থন হারানোর চেয়ে এইসব পার্টিগুলি ক্ষেতমজুরদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়াকেই বেশি সুবিধাজনক মনে করে এসেছে। মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করা হয়নি বললেই চলে। এই বিষয়ে যদি কিছু করা হয়ে থাকে যে তা হলে মালিকপক্ষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মজুরির হার কিছুটা পরিমাণে বাড়ানো কোনো সত্যিকারের সংগ্রাম ছাড়াই।’[২৯]

(পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুর ৠ অশোক রুদ্র)

আখ্যান যেহেতু বর্তমানে সময়ের দলিলীকরণ হিসেবে মান্যতাপ্রাপ্ত। ‘জলতিমির’-এ মূল বিষয়বস্তু পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা হলেও পশ্চিমবঙ্গের এই আর্থ সামাজিক দিকগুলি খুবই স্বাভাবিকভাবে আখ্যানে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। দেবেন্দ্র চৌধুরী যিনি এককালে জমিদার হয়েও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান এবং স্বাধীনতার পর পেনশন বা তাম্রপত্র গ্রহণ করেননি, তার মধ্যেও রয়ে যায় সামন্ততন্ত্রের ছায়া।গ্রীষ্মকালের যে সময়টা জলের হাহাকার লেগে যায় রবিদাসপাড়ায়, সেই সময়টাতেই দেবেন্দ্র চৌধুরীর আদেশেই চৌধুরী দীঘির জল রবিদাসদের ব্যবহার করা বারণ। তীব্র ব্যঙ্গের মতো শোনায় যখন কথকস্বর

আমাদের জানিয়ে দেয়—‘দেবেন্দ্র চৌধুরী মনে অবশ্য জাত পাতের ছুৎমার্গিতা নেই। (পৃ.১০৬/ তিনটি উপন্যাস) এ যদি ‘জাতপাতের ছুৎমার্গিতা’ না হত তবে পুকুরের জল গোঁসাই দত্ত এবং বাঁড়ুজ্যেবাড়িদের গ্রীষ্মকালের ভরসার মতো রবিদাসদেরও ভরসা যোগান দিতে পারত। কালীয়দমনের যে মিথটাকে সাধন ব্যবহার করেছেন এ আখ্যানে তার প্রাসঙ্গিক ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেন প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। লেখক তাঁর বুদ্ধিমান লেখনীর দ্বারা মিথের নবনির্মাণ করে জানান কালীয়দমনের পর পরিশুদ্ধ জলে অধিকার পেয়ে—

> ‘...জনগণ আনন্দে কেঁদে ফেলল। এ-জীবন তারা কোথায় রাখবে? ফর্সা জল! তা তো মথুরা বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শ্রেষ্ঠীরা পান করে।’[৩০]

তবু এই নিষাদ, দুষাদ, ধীবররা সুস্থ জীবনের অধিকার পায় কারণ কৃষ্ণের মতোজননেতা কালীয় দমন করেছিলেন। কিন্তু একালের প্রান্তিকায়িত বর্গ কেবল আশ্বাস শুনে। কারণ একালের নেতারা নিজেদের স্বার্থই দেখে। তাই সর্দার ও রবিদাসরা যেমন গরমের সময় দীঘির জলে অধিকার পায় না, তেমনি—

> ‘জাপানের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে যমুনার জল পরিশুদ্ধ করে পাইপে টেনে অঞ্চলের মানুষের পানীয় সমস্যার সমাধানে যে পাইপ বসল, তা অদৃশ্য কারণে গাজন ও মালঞ্চের সর্দারপাড়া ও রবিদাসপাড়ায় ঢুকল না। ও কাজ নাকি পরে হবে।’[৩১]

ক্ষেতমজুরদের অবস্থা এবং সেই সঙ্গে মধ্যচাষীদের সম্পর্কের উল্লেখও সাধন করতে ভুলেন না। অপুষ্টিতে ভোগা এই মানুষগুলি যখন ও নিজেদের আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের কথা বলে তখনও তাদের গালাগাল শুনতে হয়—

> ‘—কেন? ‘রোজ’ নিচ্ছ তো ২৫ ট্যাহা?......তাও হাজার বায়না।.....তোমাদের পায়ে তেল না দিলি চাষ হয় না।......পোঁদের কাপড় খুলবে কোন দুঃখে?’[৩২]

এই উক্তি থেকে খুব ভালোভাবে বুঝা যায় যে ক্ষেতমজুরদের অবস্থা কেমন এবং তাদের মজুরী বৃদ্ধি কাদের স্বার্থের পরিপন্থী। আর কার্তিক কুণ্ডুদের মতো মানুষরা হল চরিত্র বদলাতে থাকা গ্রামের আধুনিক কর্তাব্যক্তি। যারা পুরোনো জোতদারদের আধুনিক সংস্করণ। সুদেষ্ণা চক্রবর্তী ‘পশ্চিমবঙ্গ সমাজ ও অর্থনীতি’ নামক প্রবন্ধে এরকম চরিত্রগুলির স্বরূপ বার করেছেন এভাবে—

> ‘যে নারীলোলুপ জোতদারের কথা আগের দু’তিন দশকের বাম প্রচারে শোনা যেত, তার বদলে প্রথম সারিতে এসেছে নীল ছবি দেখা, আধুনিক গ্রামীণ কর্তাব্যক্তি। সে কিছু জমি ও ট্র্যাক্টর ও উন্নত সেচের সাহায্যে চাষ করে। তবে

সিলিং-এর চেয়ে খুব উপরে নয়। লাভ বিনিয়োগ করে বাস, লরি বা কোল্ড
স্টোরেজ মালিকানায়।'[৩৩]

আবার এরাই যখন সাম্যবাদী দলগুলোর পরিকাঠামোকে সেঁধিয়ে পড়ে তখন স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণীসংগ্রাম, সর্বহারাদের লড়াই সব কেবল কিছু শব্দবন্ধ হিসেবেই রয়ে যায়। সবকিছুতেই এরা ছোটখাটো স্বার্থের হিসেবনিকেশ এনে মিলিয়ে দেয়। তাই জলের কল আখ্যাত হয় সি পি এম কল এবং কংগ্রেস কল হিসেবে। সরকারি টাকায় নির্মিত পাকা পায়খানা ভেঙে দেওয়া হয় শাবল দিয়ে। এভাবে শ্রেণী সংগ্রামের ধারাতেও অন্ধকার প্রবেশ করে।

শুভদীপের মতো সুযোগসন্ধানী আর রত্না-আশিষের মতো শখের সমাজসেবকের পরিচালিত বাণীতলা বিজ্ঞানমঞ্চের যে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন তাও এক প্রকরণসর্বস্ত বাহ্যাড়ম্বর হয়ে ওঠে। কারণ তারা কেবল মাত্র বাইরে থেকে জ্ঞান দিতে আসে। তাদের ভাষা গ্রামের হাটুরে মানুষের কানে দুর্বোধ্য ঠেকে। কারণ বক্তা ও শ্রোতার বোধ ও চেতনার জগতের পার্থক্য জমিন আসমানের। রত্নার বক্তৃতা শুনে তাই গ্রামীণ হাটুরেদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াটা হয় এরকম—

'—কেষ্টলীলা? এই যমুনার পানিতে মেইরেছিল বিষধরকে! ....মেয়েডা বলে
মরে নাই?'[৩৪]

আবার রত্না যখন সর্দারপাড়ায় যায় তখন রেবার কথা থেকেই বিজ্ঞানমঞ্চের আন্দোলনের ব্যর্থতা ফুটে ওঠে। 'আর্সেনিক রোগির গু মুতেও বিষ' জেনেও এই গ্রামের মানুষগুলো বাধ্য 'আগানে বাগানে' প্রাকৃতিক কাজগুলি সারতে। কারণটা হল আর্থিক সমস্যা। রত্নাকে রেবা বলে 'বাড়ি বাড়ি পাইখানা বসাবার ব্যবস্থা করতে। তাতে বিজ্ঞানমঞ্চের অক্ষমতার কথা বলতে রেবা সরাসরি বলে—

'—তালে মিছে পরিশ্রম! শুকনো কথায় চিড়ে ভিজাবে না! এই জলই খাবে,
জঙ্গলে হাগবে, মরতে এদের দুঃখু নেই।'[৩৫]

এসব কথা শুনে পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত রত্নার প্রতিক্রিয়া কথক আমাদের জানাননি। কারণ সম্ভবত তার সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়াও হয়নি। ফুলের পরিচর্যাওয়ালা কাঠের বাতাসহ টিনের চারচালা ছাউনির ঘরে বসে সদ্য স্নাত, চুল আঁচড়ানো ফর্সা, মুখের ঝিকে ঈষৎ রক্তিমাভা, নাকে সোনা ঝিনুকের একটি নথ আর কানে দুল পরা একজন বউ এর মুখে এ কথাগুলো হয়তো তার শ্রেণীকক্ষে ভারতের দরিদ্রতম গ্রামের অবস্থা শোনার মতোই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার পরই সারা শরীরে বুটি বুটি দাগওয়ালা শ্যামা হালদারের মুখে 'আর চার পাঁচ দিন মাত্তর! কারবার খতম!' শুনে সে ভয়ে হিম হতে থাকে। তবুও শেষ পর্যন্ত সে

দশটা টাকা দেবার বেশি কিছুই করতে পারে না, এমনকি ওষুধ এনে দেবার কথা দিয়েও তা রাখতে পারে না। আসলে—

> ‘ঔপন্যাসিক ইঙ্গিত দিয়েছেন, রত্নার মতো এলিট বর্গভুক্ত মেয়েরা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে না যেহেতু তাদের ব্যক্তি উৎস ও সামাজিক চর্যায় অনন্বয়ের যথেষ্ট সূত্র থেকে যায়।’[৩৬]

অন্যদিকে রত্নার সঙ্গে তুলনার সূত্রে সাধন তুলে আনেন গ্রামীণ সমাজে নারীর প্রান্তিকায়িত অবস্থার বর্ণনা। কলেজে পড়া রত্নার সাবলীল বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনিরুদ্দিন ও আবু নামধারী দুই চাষীর কথোপকথনে উঠে আসে ব্রাত্য এই গ্রামের পুরুষশাসিত সমাজে ব্রাত্যতর নারীর অবস্থা—

> ‘— ...কোথায় পায় এত তেজ? মোদের পরিবারের ছাওয়ালরা চেরডা কাল ছাগল রয়ে গেল!
>
> — হুঃ! রোজ রাতে মাগ গোঁতাও আর পুটকি মারো....তেজটা পাবে কেন?
>
> — কী কামে লাগফে ওই তেজ?’[৩৭]

যদিও এ আখ্যানে উল্লেখযোগ্য আরো দুটি নারীচরিত্র অন্নপূর্ণা ও রেবা দুজনের অবস্থা গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের থেকে কিঞ্চিৎ ভালো। কিন্তু সাধন চট্টোপাধ্যায় সামান্য সুযোগে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন প্রান্তিকায়িত বর্গের প্রান্তেবাসী নারীদের কথা। দুপুরে ধূপকাঠি বানানোর সময়টুকুতে জমে ওঠা মজলিসের বর্ণনা স্বল্প বাক্যে যেন পুরো গ্রামের নারীদের জীবনী—

> ‘এইভাবে মশলামাখার দুপুরগুলোর ক্ষুদ্র আলোচনার পরিসরে, নানান নিন্দাবাদ ও কাল্পনিক অভিযোগের মধ্যে দিয়ে প্রতিদিনের বেঁচে থাকাটা ওরা ঝালিয়ে নেয়। যেন নিস্তরঙ্গ এঁদোপুকুরের জল সামান্য সরিয়ে তৃষিত ব্যক্তিরা এক আঁজলা তুলে নেয়। রাতে স্বামীর অস্বাস্থ্যকর দাবীতে অনিচ্ছায় ক্লান্ত সাড়া দেয়া, সকালে গেরস্থালি, এই দুপুর এবং বিকেলে গাছগাছালির অনড়, বিষাদময়তার মধ্যেও তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বলে এবং নক্ষত্র খচিত প্রকাণ্ড আকাশের নিচে জীবনের স্রোত কুলুকুলু বয়ে যায়।’[৩৮]

আসলে রত্না বা তার মতো মধ্যবিত্তরা এ জীবন জানে না, বোঝে না। তাই তার বয়ান যেমন নিম্নবর্গের মানুষজনদের কাছে দুর্বোধ্য রয়ে যায়, ঠিক তেমনি নিম্নবর্গের এই মানুষদের ব্যবহৃত শব্দ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের অজানা। দুই শ্রেণীর এই দূরত্বটুকু বোঝানো জন্যে সাধন যেন ইচ্ছে করে ‘জন্ডিস’ শব্দটা

ব্যবহার করেন না, বলেন 'হলুদরোগ'। তারপর জানান—'ওরা বলাবলি করল ন্যাবা!' বা কোনো এক উদ্দিষ্ট গ্রহিতাকে কথকের ঢঙে গল্প শোনাতে শোনাতে মধ্যেখানে ধারাবাহিকতা কেটে প্রশ্ন তোলেন—'বাঁওড় কী?' (পৃ.১১২) কারণ সত্যিই তো পাঠক জানেন না 'ন্যাবারোগ' কী বা বাঁওড় কী বা 'ফল দেখা' কী! তথাকথিত এলিটরা এই মানুষগুলোর সম্বন্ধে কতটা জানে তা এর থেকেই প্রমাণিত। গ্রামের আধপেটা, না খেতে পাওয়া মানুষগুলোকে যারা গবেষণার গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে তাদের অজ্ঞতাও কতদূর তা লেখক এভাবে জানিয়ে দেন—

> 'অবশ্য মৃত্যুর আগে অনেক কিছু না জেনে চলে যাওয়াই মানুষের ধর্ম। তিনি যত বড় ক্ষমতাবানই হোক না কেন। যেমন ড. অভয়ঙ্কর চক্রবর্তী যেদিন প্রয়াত হবেন, জেনে যেতে পারবেন না এ পৃথিবীতে একটি মনুষ্যদেহ ৯১ বছর ধরে এত কম প্রোটিন, ভিটামিন এবং ন্যূনতম ক্যালরি গ্রহণ না করেও চিকিৎসা শাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম উল্টে কীভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করেছিল। তাই বা কেন, এখনও যারা এ পাড়ায় জীবিত তারা শরীর বিজ্ঞানের কোন নিয়মে টিকে আছে?'[৩৯]

জন্ম মৃত্যু এই অঞ্চলে কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। মৃত্যু তাই এ আখ্যানে অতি সাধারণভাবে আসে। অন্নপূর্ণার মৃত্যুর উল্লেখ করে আখ্যানের প্রারম্ভ। তারপর কাহিনি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাই রামপ্রসাদ, শ্যামাপদ, পঞ্চানন, কালীপদ প্রভৃতির একের পর একের মৃত্যু সংবাদ। অভয়ঙ্কর বা সুচারু সান্যালদের মতো ব্যক্তিরা তাঁদের অগাধ পণ্ডিত্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে এই বাস্তবতাকে ছুঁতে পারেন বা। এন. জি ওগুলোর পরিবেশ আন্দোলন নিয়েও তাই প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে উন্নত দেশগুলির চালানো আর্সেনিকের সমস্যার বিরুদ্ধে তৎপরতা সম্পর্কেও রাজনীতিবিদ হিমাংশু মণ্ডল তাই তির্যক উপমায় পেশ করেন বিষয়টি। বলেন—

> 'ধর , তোমার কাঁধে কাকে হেগে দিয়েছে, টের পাওনি। একজন পেছন থেকে এসে বলতেই তুমি তৎপর হলে এবং সে জল-টল এনে দিলে, তুমি তার হাতে ব্যাগটা দিয়ে পোষ্কার করে যখন পেছন ফিরলে—তখন চম্পট!......এখন কাঁধে যে কাক হেগেছে, তা সত্যি। বিরোধিতা করলে ভুল হবে। কিন্তু ওই ব্যক্তিটি কি সহানুভূতির জন্য তোমাকে সাবধান করে, জল-টল এনে দিয়েছিল? নাকি উদ্দেশ্য তোমার ব্যাগটি হাতাবার? ফলে, কাঁধের নোংরা তোমাকে জানিয়ে দেয়াটা সত্যি, কিন্তু সবসত্যি নয়। এখানেও তাই।'[৪০]

পাঁচ

লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় কেবল সমাজ জীবনের অনন্বয় ও অসমাঞ্জস্য জাত জটিলতা দেখান না ব্যক্তি জীবনও তার সমান উদ্দিষ্ট। ভোগবাদী বিশ্বায়নের ছায়ায় কার্তিক, সুব্রতদের ধনী থেকে আরো ধনী হওয়ার প্রচেষ্টা, ভীম রবিদাসের কার্তিক হয়ে ওঠার প্রাণান্ত চেষ্টা, বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সবই লেখক তুলে ধরেন। আবার বাদ যায় না দেবেন্দ্র চৌধুরী বা রত্নার মতো চরিত্রের মধ্যে স্ববিরোধিতা। এককালের জমিদার দেবেন্দ্র চৌধুরী যিনি একইসঙ্গে স্বপ্নবিষয়ক একটি খাতার লেখক, প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে বর্গার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামী আবার পরবর্তী কালে বর্গা বিলির কাজে সহায়ক। আর 'রত্না নীতির বিশেষ ধার ধারে না আবার সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্তও নয়' (পৃ.১৩৬)। গো সাপ দেখে তার প্রতিক্রিয়াতে ফুটে ওঠে সেই অমঙ্গল মেনে চলা প্রাচীন চিন্তাধারার ছায়া—

> '...যখন সর্দার পাড়ায় ঢুকতে যাবে, ঝোপ চিরে একটি গো-সাপ... চকিতে মিলিয়ে গেল। বুকটা ধড়ফড় করে কিছুক্ষণ ধরে। এটা কি সত্যি প্রাণী নাকি কারও ছদ্মবেশ? কালকেতুর সঙ্গে যিনি এসেছিলেন আসলে ছিলেন বনচণ্ডী। এটা কী? কালান্তক যম? কী যাচ্ছেতাই ভাবছে রত্না? বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মী হয়ে এসব চিন্তা কেন যে হয়?'[৪১]

আসলে চাইলেই কি এতো দিনের লালিত সংস্কার মুছে ফেলা যায়? কোনো না কোনোভাবে প্রাচীন তার ছায়া বিস্তার করে। রত্না বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মী হয়েও মঙ্গল অমঙ্গলের ধারণা একেবারে মিটাতে পারে না। দেবেন্দ্র চৌধুরী সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারাকে যদি বা মুছে ফেলে বর্গা বিলিতে সাহায্য করেন তথাপিও নিম্নবর্গীয় লোকেদের জন্যে গরমদিনে পুকুরের জল ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারেন না। মনে করেন মানুষের জীবনে স্বপ্নের একটা প্রভাব আছে।

আবার এই বিষয়টিকে একটু অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে আসলে বাস্তবজীবন তো এরকমই। একরঙা চরিত্র কী বাস্তব জীবনে হয়? সময় পরিবেশ, মানুষ অভিজ্ঞতা কত কিছু প্রভাব বিস্তার করে মানুষের চিন্তাধারায়। তাই বামপন্থী সুধীর সরকার 'এখন আড়িয়াডাঙা অর্থাৎ মাইল দশেক ভেতরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অপ্রত্যক্ষ মদতে চালিত একটি সংস্থার মাতব্বর' (পৃ.১৫৫)। আর দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী উপলব্ধি করেন দেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি আজও ভালোভাবে অনুশীলন করা হয়নি তাই সব বুজরুকি বলা

অনুচিত। অন্যদিকে প্রযুক্তির সাহায্যে চাষ ভবিষ্যতে বিপদ আনতে পারে বলেও তার সন্দেহ জাগে। যে লেখক বিশ্বাস করেন উপন্যাস হচ্ছে full of dialectics, ব্যক্তিজীবনে ভাবনা চিন্তায় জীবনধারায় নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব উপন্যাসের চাবিকাঠি, তাঁর উপন্যাসে এই বিরোধভাস, দ্বিচারিতা যে ফুটে উঠবেই এতে আর সন্দেহ কি?

আস্তিক অন্নপূর্ণা মৃত্যুর আগে স্বামী পরাণকে বলেছিল যে তার অকালমৃত্যু হলে বনবিবির থান তুলে ফেলতে। কিন্তু পরাণ তা পারে না। সমাজের নিয়ম সংস্কারকে ব্যক্তি হিসেবে সে যেমন অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি রয়ে যায় তার নিজস্ব মানসিক বন্ধন। তার বহুকাল অর্জিত সংস্কার তার মৃত প্রত্নতত্ত্বের প্রাণীর প্রতি প্রেমকে ছাপিয়ে যায়। তার মনে হয়—

> ‘যে দিন গোধিকাদুটিকে মারতে বাধা দেওয়াটা উচিত হয়নি তার। ওরা অমঙ্গল, অশুভ। মানুষের সংসারে নানা শরীর নিয়ে নিয়তি ভালোমন্দ হিসেবে আবির্ভূত হয়। কেউ সেদিন কথা বলেনি। ও একলা কেন চেঁচাতে গেল? হয়তো তারই প্রত্যক্ষ ফল এটি।’[৪২]

সাধন চট্টোপাধ্যায় এভাবে উন্মোচিত করতে চান মানুষগুলোর শিকড় কোথায় প্রোথিত। তাই বারবার গোসাপের প্রসঙ্গে আসে মঙ্গল-অমঙ্গল কথা, ফুল্লরা-কালকেতু-চণ্ডীর কথা। তবু এও সত্য যে পৃথিবী বদলাচ্ছে, বদলানোই তার ধর্ম। শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান চেতনায় পরিবর্তন আনছে। অন্তত চেতনার একটি স্তরে তো বটেই। তাই রেবা অন্নপূর্ণা ফিল্টার ফিটকরি জলের বোতল ব্যবহার করে। অনেক নারী দুপুরে ধূপকাঠি বানানোর কাজ নেয় ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ যোগানোর জন্যে। তাই লেখক উল্লেখ করেন ভাঙা রাজবাড়ির কথা, পুরোনো ধুলো মাখা জংধরা মোটর গাড়ির কথা। বুঝে নেওয়া যায় সামন্ততন্ত্রও বিগত। তবু কাঠামো রয়ে যায়। মানুষের চিন্তায় তাই জমিদার বাড়িই রাজবাড়ি হিসেবে ধরা থাকে। আর তাই আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতের বৈশিষ্ট্য লেখক এভাবে ধরেন—

> ‘জমিদারি হেজেমজে লাটে উঠলেও, রক্তের সম্ভ্রম এখনও ব্রাত্যজনদের কাছে পুরোপুরি কৌলিন্য হারায়নি।’[৪৩]

আর—

> ‘জীর্ণ ইটের বনেদী বাড়িগুলোর মধ্যে ছায়া নীরবতা ও ভয় ভয় অনুভূতি নিয়ে ১০০/২০০ বছরের স্তূপীকৃত সময় যেন পুঁথির গন্ধ হয়ে আটকে আছে।’[৪৪]

ছয়

> 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিলো সেই সব অসংখ্য মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারগুলির একটিতে, যে পরিবারগুলি ভারতের স্বাধীনতার দাম হিসেবে পূর্ববাংলার শান্ত গৃহাঙ্গনের সামান্য দিনান্তিক স্বাচ্ছল্যটুকু ছেড়ে উৎক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল সর্বস্বান্ত করা এক ভারতমুখী পথযাত্রায়। ভারতের স্বাধীনতার উৎসব তাঁর স্মৃতিতে ধরা নেই।'[৪৫]

যে লেখক স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করেন দেশভাগ দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখালেখিতে কোথাও না কোথাও রাজনীতিবিদ ও নেতাদের সুবিধার্থে হওয়া দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লুকায়িত থাকবেই। পশ্চিমবাংলার যে বিশেষ অঞ্চল এই আখ্যানের বর্ণিত হয়েছে তা বাংলাদেশের নিকটবর্তী অঞ্চল। যমুনা নদীর এপার ভারত ওপার বাংলাদেশ। যে সমস্যাগুলি এপারের মানুষ ভোগ করছে তা ওপারে সমান সক্রিয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পুষ্টিহীনতা সবচেয়ে বড়ো কথা হল যে আর্সেনিকের স্তর গাজন মালঞ্চের জল বিষাচ্ছে সেই স্তরটি—

> 'আমাদের ভাগীরথী হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চল ধরে বাংলাদেশের এপারে ছড়ানো।'[৪৬]

তবু দুটি দেশ, মধ্যেখানে বর্ডার। যে সীমান্ত বাঁধা হয়েছিল আজ থেকে ৬৫-৬৬ বছর আগে বহু মানুষের জীবন বিধ্বস্ত করে, সেই সীমান্ত আজও মানুষের জীবনে বিষ চড়াচ্ছে। চোরাচালান কারবার, তার জেরে খুন, সীমান্ত রক্ষা বাহিনির হাতে এ অঞ্চলে মানুষের নাজেহাল হওয়া এ সমস্ত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আখ্যানে। বারবার উল্লেখিত হয় নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড এর কথা। বিষয়টি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে যখন দেখি নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড এ যমুনার পাড়ে শ্মশান। সাধন চট্টোপাধ্যায় বিষয়টিকে বিস্তৃতি দেন এভাবে—

> 'কিন্তু নদীর পারে, নো ম্যানস ল্যাণ্ডে, নিদ্রা জাগরণ নেই। জীবিতরা মৃত সাথীদের সৎকারটুকুর পর সাময়িক লোভ, লালসা এবং অন্তরের জীগিষা ভুলে থাকে এবং মৃতেরা জানাতে পারে না, রাষ্ট্রের খাঁচা কতখানি কন্টকময়—নো ম্যানস ল্যাণ্ডের তুলনায়।'[৪৭]

রাষ্ট্রের মানে যাদের জীবনে বিভিন্ন ভাবে ক্ষমতার জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হওয়া তাদের কাছে নো

ম্যানস ল্যাণ্ডই যেন অধিক কাম্য। অন্নপূর্ণার সৎকার শেষ করে নো ম্যানস ল্যাণ্ডে বসে থাকা পরানের 'তাই একবার ওপারে যাবার' ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু ওপারে তো একই অবস্থা আবার নো ম্যানস ল্যাণ্ডে তো কেউ থাকতে পারে না, ফলে 'তাকে ফিরতে হয় একটি রাষ্ট্রের আওতায়' পরিচিত পরিবেশে—যেখানে একটি মৃত্যু হাজার জীবনকে স্তব্ধ করে না, তা যত প্রিয়জনেরই হোক।'(পৃ. ২২২/তিনটি উপন্যাস) বর্তমান আলোচকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সাধন এই অংশটি সম্পর্কে বলেছিলেন যে আসলে আমরা যতই মুক্তির চেষ্টা করি না কেন আবার বন্ধনে ফিরে আসতে হয়। অনেকটা মিথ অব সিসিফাসের মতো। এ কেবল পরানের জীবনে নয় আমাদের সকলের জীবনেই তাই। পরান চলে গেছিল নো ম্যানস ল্যাণ্ডে কিন্তু তাকে ফিরে আসতে হয়। এই চেষ্টার মধ্যেই রয়েছে গ্লোরিয়াস ব্যাপারটি।

পরান আবার কখন রাষ্ট্রের আওতায় চলে আসে সে নিজেও বুঝতে পারে না। রাষ্ট্রযন্ত্র প্রহসনের মতো এইসব মৃত্যুর তদন্ত করায়। তাই সাধন আমাদের এইভাবে উপসংহারে পৌঁছে দেন 'কাল থেকেই শুরু হতে পারে অন্নপূর্ণার মৃত্যুর তদন্ত '(পৃ.১২২)

এই সমাপ্তিবিহীন উপসংহার থেকে আমরা বুঝে নিই কোনো সান্ত্বনা নেই এই নিম্নবর্গীয়দের জীবনে। আগের মতোই অর্থহীনতায় যাপিত হয়ে জীবন। পরান হেঁটে আসতে আসতে আবছা অন্ধকারে স্বপ্নের মতো দেখতে' পায় ম্লান আলোতে দুটি গোধিকা দুজন মহিলা হয়ে দুদিকে চলে যায়। চণ্ডীমঙ্গলে স্বর্ণ গোধিকার রূপ নিয়ে আসা চণ্ডী ব্যাধ কালকেতুকে রাজা বানিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বাস্তব জগতের নিম্নবর্গীয়দের জীবনে রাতরাতি রাজা হওয়া হয় না কখনোই। এ যে ম্লান আলোর মায়ায় দেখা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয় তা পরান জানে তাই তাকে আসতে হয় পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীনে। যেখানে সবাই তার অপেক্ষা করে, যেখানে এতোকিছুর পরও আগামীদিনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে নতুন কোনো প্রহসন।

সাত

ব্যতিক্রমী এই আখ্যানকার জানেন এবং মানেন—

> 'সময়ের মুখ শুধু সাময়িকতায় নয়, ভিন্ন একটি মুখ আছে—যাকে বলা হয় পরম্পরা। সৃষ্টির যান এক চাকায় চলে না, দুটি চাকা দরকার হয় ; সাময়িকতা ও

পরম্পরা।...সাময়িকতানির্ভর গল্প উপন্যাস নিয়ে হইচই, দূরের অতীত হয়ে গেলেই বিবর্ণ হতে বাধ্য।...সাময়িকতাকে পরম্পরার যোগসূত্র বানালেই ব্যাপারটা বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে।'[৪৮]

তাই সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের তথা তৃতীয় বিশ্বের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক কেবল এটুকুতেই নিজের লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। খণ্ড সময়কে যুক্ত করেন মহাসময়ের সঙ্গে। আর একাজে তাঁর প্রধান সহায়ক হয় মিথ। তাঁর ভাষায়—

মিথ হল অতীতের বাঁকা সত্য যার মধ্যে বর্তমানের সত্য লুকিয়ে আছে।'[৪৯]

আর সাহিত্যে মিথ আসে তার কারণ লেখকের ভাষায়—

'...আজকের জনৈক ব্যক্তি তো শুধু আজকেরই নয়, তার জিনের মধ্যে বয়ে এসেছে হাজার হাজার বছরের অতীত, ঐতিহ্য। গর্ভের অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর আলো যখন দেখতে পায়, দীর্ঘ অতীত থাকে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। তাই মিথ, স্বপ্ন প্রতীক মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। এই মিথ এর মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় বর্তমান সময়ের কিছু চিহ্ন। তাইতো আমাদের সমাজে মিথ্ যেমন ভাঙে, গড়ে ওঠে অজস্র মিথ। Text এই প্রক্রিয়া অর্থাৎ মিথ ভাঙা-গড়া আত্মস্থ করতে চায়।'[৫০]

'জলতিমির'এ তাই মিথ আসে বর্তমানের সত্যকে বর্তমানের চিহ্নকে আত্মস্থ করে পুনর্নির্মিত চেহারায়। কালীয়র বিষে বিষাক্ত জলের সঙ্গে তুলনা করা হয় আর্সেনিক বিষাক্ত জলের। আখ্যানের দ্বিতীয় পর্বে 'কালীয় দমন' শিরো নামে কৃষ্ণের কালীয় দমনের প্রত্নকথাটি নবনির্মাণ করা হয়েছে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য দেওয়া রত্নার বক্তৃতার মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক তথা সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেন—

'কালীয় দমনের প্রত্নকথা যখন সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার নিরিখে পুনর্ব্যাখ্যাত হচ্ছে, আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার আক্রান্ত গ্রামবাসীদের চেতনার প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে ওই নতুন ভাষ্য থেকে ওরা অর্থবহ চিহ্নায়কের উপলব্ধিতে পৌঁছাবে কিনা। এবিষয় নিয়ে বাখতিন গভীর আলোচনা করেছেন, Marxiam and the philosophy of language' বইতে। 'জলতিমির' এর প্রতিবেদনে স্তরে স্তরে বর্তমানের সঙ্গে ঐতিহ্য সম্পৃক্ত যেমন, তেমনি বর্তমানের মধ্যেও জীবনের কত বিভঙ্গ। এই বিচিত্র সমান্তরালতায় লালিত হচ্ছে

> সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা আর গোষ্ঠী ও ব্যক্তির নানা টানাপোড়েন। সব কিছুর ফলাফল হলো অজস্র চিহ্নায়ক খণ্ডিত ঔপন্যাসিকতা। কালীয় দমন পর্বে এবং অন্যত্র প্রমাণিত হচ্ছে বাখতিনের নিম্নোক্ত মন্তব্যের সার্থকতা, 'Signs emerge after all, only in the process of interaction between one individual consciousness and another. And the individual consciousness itself is filled with signs. Consciousness becomes consciousness only once it has been filled with ideological (semiotic) content, consquently, only in the process of social interaction,'(১৯৯৬ঃ ১১)
>
> সাধনের ঔপন্যাসিক সত্তা এবং তাঁর পাঠকৃতি এই সামাজিক মিথক্রিয়ার ফসল। তাঁর ব্যক্তিচৈতন্য আর উত্থাপিত প্রতিবেদনের প্রতিটি স্তরে সামাজিক ভাবাদর্শের আলোছায়া ব্যক্ত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনো নন্দন নেই, চিহ্নায়কও নেই। তাই কালীয় দমনের প্রত্নকথা যখন পুনর্নির্মিত হয়, বাচনের বিন্যাসেও প্রতিফলিত হতে দেখি 'Philosophy of the ideological sign (তদেব ঃ১৫)। পাঠক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ওই চিহ্নায়ক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যাওয়া।'[৫১]

লেখক তো কেবল কালীয়নাগ তার বিষ নিয়ে পাঁচ হাজার বছর ধরে জীবিত আছে বলছেন না সঙ্গে থাকছে আরো নানা অনুষঙ্গ। ইশারায় প্রকাশিত হয় তাই আরো বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের অন্তঃস্বর। লেখক কালীয়কে পরিচয় দেন আদিম কৌম সমাজের প্রধান বলে আর এই টোটেম উপাসক ব্রাত্য অপাংক্তেয় সর্পগোষ্ঠীর জাতবৈরি হিসেবে উত্থাপিত করেন গরুড়কে। ব্রাত্য সর্পগোষ্ঠীর বাসস্থান হত লোকালয়ের শেষ প্রান্তে, পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল বা জলাভূমির পাশে। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা সামাজিক ভেদাভেদ, প্রাক্ সভ্যতার তীব্র হানাহানির সঙ্গে একালের সমান্তরাল ঘটনা একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায় যখন লেখক বলেন—

> 'বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে সমূহে নির্মূল করার জন্য ওই সর্পরূপী নরমাংস ভক্ষণের পথ বেছে নেওয়া হয়।...গরুড় এই পথটি আইনসিদ্ধ করলেও পৃথিবীর মানুষ আজও আইনের আড়ালেই প্রথাটিকে রেখে কার্যসিদ্ধি করছে। শুনেছি হিটলার

> নরডিকদের প্রতিনিধি হয়ে লক্ষাধিক সেমেটিক মানুষের মাংসভক্ষণ করেছিলেন। এই সেমেটিকরা এখন আরবদের ছাল চামড়া চাইছে, আরবরাও চোরাগোপ্তা শত্রুপক্ষকে ছেড়ে দিচ্ছে না। এই তো সেদিন, আফ্রিকার হুটু ও টুটসিরা পরস্পর পরস্পরের লক্ষাধিক নারী শিশু কোতল করে দিব্যি মহাভোজের ব্যবস্থা করল। সার্ভদের বাজারে বসনিয়াদের মাংসের চড়া দর, আমাদের ঘরের কাছে লঙ্কাদ্বীপে সিংহলী ও তামিলদের মধ্যে পারস্পরিক ছাল ছাড়ানো মাংসের কিমা, চচ্চড়ি বা কালিয়ার নিলাম দর মন্দ নয়। এই মাংসের রন্ধনশালা ছিল ইউরোপে। তেল-মশলা, জ্বালানীর খরচ ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং ওরা উন্নত দেশ বলে, ইদানীং ঝুট ঝামেলা ঠেলে দিয়েছে উন্নয়নশীল বা তিননম্বর ছাগল বাচ্চাদের ঘরে ঘরে।...... সব কিছুই নিয়ম বেঁধে চললে কোনও গোল বাঁধে না। শুনেছি হিটলার শৃঙ্খলা খুবই পছন্দ করতেন। সাম্প্রতি সার্ভ জাতিও সুশৃঙ্খলার জন্য বসনিয়ায় যুদ্ধবন্দীদের যার যার কবর খুঁড়িয়ে নিত যাতে বিনা বাধায় ঠিকঠাক মানুষটি আপন কবরে আশ্রয় নিতে পারে। শৃঙ্খলা মানবসভ্যতার বিশেষ একটি ঐতিহ্য।'[৫২]

তীব্র দহনসময় সময়ের আখ্যান ফুটে ওঠে প্রত্নকথায়। পাঠকের কাছে এই সংকেত পৌঁছে যায় যে এ কেবল একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের আর্সেনিক সমস্যা নয়, সমগ্র মানববিশ্ব সম্পূর্ণ পৃথিবীর একটা বড়ো সমস্যার সঙ্গে তা একত্রীভূত। গরুড়ের আক্রমণ থেকে সৌভরি মুনি কালীয়কে এবং তার সর্পগোষ্ঠীকে বাঁচান কারণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা তাঁর ইঙ্গিত ছিল। এ প্রসঙ্গে তাই এসে যায় মেধা পাটেকার, সুন্দরলাল বহুগুণা ও বাবা আমতের নাম। আবার লেখক পুরো নিজস্ব ঢঙে বিবৃত করেন যে বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন অন্যায় কাজকর্ম রাষ্ট্রসংঘ দেখেও না দেখার ভান করছে—

> 'সেই যুগে প্রবল শক্তিশালীর পক্ষে মূর্তবিবেকের নিষেধাজ্ঞা অমান্য সম্ভব ছিল না। আজ যেমন রাষ্ট্রপুঞ্জকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে, পেছনে কলা দেখিয়ে ঘুরিয়ে প্যাঁক দিয়ে, মহাশক্তিধর দেশগুলো সুবোধ বালক হয়ে আছে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করছে না', পারমানবিক বোমা পরীক্ষার নামে মাটি, সমুদ্র, বাতাস বিষিয়ে না দিয়ে গুডি-গুডি বয় হয়ে থাকছে প্রাচীন আমলে এভাবে সম্ভব ছিল না।'[৫৩]

কিন্তু ইতিহাসের নিষ্ঠুর খেলার কিছুদিনের মধ্যে কালীয় তার ক্ষমতা বিস্তার করতে শুরু করল। কালীদহের তীরবর্তী ধীবর, দুষাদরা তার বিষে আক্রান্ত হতে থাকল। সাধন এদের অবস্থা বর্ণনা করেন

আর্সেনিকে আক্রান্ত মানুষদের মতো করে। আবার এ সূত্রে সাপের বিষে পশ্চিমবঙ্গের এক বৃহৎ সংখ্যার মানুষের মৃত্যুকেও লেখক উপস্থাপিত করেন। যুক্ত হয় বেহুলা লখিন্দরের মিথটিও। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে পার্থক্য তৈরি হয়ে যায় সত্য ও তথ্যের মধ্যে। তাই এখন জলের ছোঁয়ায় মৃত প্রাণ ফিরে পায় না বরং জলই ছিনিয়ে নেয় প্রাণ। কালীদহের বিষাক্ত জলে আক্রান্ত ধীবর, দুষাদ নিষাদদের বাঁচাতে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণ। বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী লেখক কৃষ্ণের এই সংগ্রামকে আবার যুক্ত করেন বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ঘটনার সঙ্গে—

> ‘নিরীহ মানুষকে বাঁচানোর দুর্জয় প্রয়াসই যে কোনও বিপদকে তুচ্ছ মনে করতে পারে। নইলে কোথায় বালক কৃষ্ণ আর বিপুল শক্তিধর নাগ কালীয়! এই পরম্পরার জন্যই বোধ হয় ছোট ভিয়েতনাম বা একফোঁটা কিউবা একটি শক্তিধর যুদ্ধাগারের কালীয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মেকং বা ক্যারিবিয়ান উপসাগরের কালীদহে নেমে পড়েছিল।’[৫৪]

‘জলতিমির’ উপন্যাসের কোনো বিশেষ একটি দিককে লেখক তীক্ষ্ণতা দিতে চেষ্টা করেন নি কারণ সেক্ষেত্রে আখ্যান হয়ে পড়ে একরৈখিক। আখ্যানের বহুরৈখিকতা এবং অর্থের বিভিন্ন দ্যোতনা তৈরি করতে গিয়ে তাই প্রত্নকথার ব্যবহার হয়। আবার প্রত্নকথার বিবরণের মধ্যে প্রবেশ করে একালের বৈজ্ঞানিক তথ্য, অনুপুঙ্খ—

> ‘এই নৃত্যের ফাঁকে কালীয় ভাবছিল অসংখ্য ফণার যে কোনও একটিকে কাজে লাগিয়ে চোরাগোপ্তা কৃষ্ণকে অন্তিম মার দেবে। কৃষ্ণও তা বুঝতে পেরে এমনই তাল সৃষ্টি করে চলল, যখনই কোনও ফণা চকিতে হিসিয়ে ওঠে, ছোবলাতে উদ্যত ঠিক তক্ষুনি কৃষ্ণের পায়ের মহাভারে তা ভেঙে, মটকে গিয়ে রক্তাক্ত ঝুলে পড়তে থাকল। ...এমনিভাবে এক একটি ফণা ভেঙে মটকে থেতঁলে পড়ছিল যত, জলের রং পাল্টাতে থাকে। এগুলো যেন কালীয়র ভগ্ন ফণা নয়, জলের ব্যাকটেরিয়া, আর্সেনিক, সিসা বা লোহার গ্রেডিয়েন্টের এক একটি শক্ত অস্তিত্ব। চুন, ফিটকিরি, ক্লোরিন থেকে শুরু করে এক একটি পরিষেধক ছড়ানো হচ্ছে, জল হয়ে উঠছে টলটলে।’[৫৫]

সাধন চট্টোপাধ্যায় এই অভিনব লেখন পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য লেখেন—

'বাখতিন/ভোলোশিনোভ বিশ্বাস করেন, 'Language is not individual activity but a cultural his torical legacy of mankind. (১৯৯৬ ঙ্খ১৬৮) কথাটা তলিয়ে ভেবে দেখার মতো তা পরিবেশবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক মননে নিষ্ণাত জলতিমির এর ভাষা লক্ষ করলে স্পষ্ট হতে পারে। প্রত্নকথার অনুপুঙ্খকে কিছুটা বদলে নিয়ে সাধন লেখেন, শাপগ্রস্ত শরীর ত্যাগ করে কালীয় যখন কালিদহ ছেড়ে গোঠে উঠে এলো—তাপদগ্ধ আকাশ থেকে স্ফটিক জলের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বারিবিন্দু অঝোরে নেমে এসেছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিধ্বস্ত ভারসাম্য যখন ফিরে পাওয়া যায়, 'বলরাম সেই মুহূর্তে উপস্থিত'। হলধর বলরাম অর্থাৎ কৃষিপ্রক্রিয়া। কিন্তু সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন উপন্যাসিক জানেন বোবা জনচিত্ত ভয় সংস্কারে নির্বাক' (পৃ.৩১) থাকে। অভিজাত সেব্য জলে তাদের অধিকার নেই এই জেনে। এই বিন্দুতে প্রত্নকথার সীমারেখা ভেঙে নতুন কৃষ্টিনেতা হিসেবে হাজির হন কৃষ্ণ। বংশপরম্পরায় কালিদহের বিষাক্ত জল পান করা যাদের আজন্ম অভ্যাস তাদের দ্বিধা কাটাতে নতুন কৃষ্ণ বলেন 'ক্ষমতার গর্ভেই পাপ জন্মায়। .....এ হ্রদ এখন থেকে মানুষের জন্য (তদেব)। অর্থাৎ আধিপত্যবাদের চক্রব্যূহ থেকে ছিনিয়ে আনা হলো মানুষের অধিকার, প্রকৃতি প্রদত্ত অদূষিত পানীয় জল ব্যবহার করে বেঁচে থাকার অধিকার।'[৫৬]

কেবল এই কালীয় দমনের প্রত্নকথা নয় সমসাময়িকতাকে পরম্পরার সঙ্গে মেশাতে গিয়ে আখ্যানকার যথাযথভাবে ব্যবহার করেন ফুল্লরা কালকেতু চণ্ডীর কথা বনবিবি-দক্ষিণরায় শা-জঙ্গলীর কথা। যে স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে ব্রত কথার দেবদেবীদের উদ্ভব, সেই আকাঙ্ক্ষাও মিশে যায় আখ্যানে। বনবিবির থানে পুজোর দিন রাতে ধোনা মোনার গল্প শুনে মালতী ভাবে—

'দুখেকে তিনি মনিরত্ন পাঠিয়েছেন। কে জানে, কার কপালে কী আছে!'[৫৭]

আবার অন্নপূর্ণার মা-বাবা ফুল্লরা কালীপদর নামের মধ্যেও যেন ফুল্লরা কালকেতুরই স্মৃতি জড়িত। তাদের জীবনধারণের সমস্যাবলীয় সঙ্গে ফুল্লারার বারমাস্যা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। লোকসাহিত্য যেহেতু মানুষের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে তাই আখ্যানে যখন লোকসাহিত্যের কোনো বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হয় তখন আখ্যানে সেই ঐতিহ্য গ্রন্থিত হয়ে যায়। ফলে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত আখ্যানেও প্রকাশিত হয় মানুষের বহুকাল ধরে অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতা। 'জলতিমির'-এ সাধন চট্টোপাধ্যায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন, যেমন—

'উনোর উশুল দুনো করে ছাড়বে।'[৫৮]

অথবা

'বরের মাসি কনের পিসি

ঘর জ্বালিয়ে বসতে আসি' ইত্যাদি।'[৫৯]

আট

যে কথাকার নিজে সাহিত্যকে বিচার করেন 'কনটেন্ট ও ফর্মের নিপুণ ভারসাম্যের ওপর', তাঁর রচনায় যে বিষয়, আঙ্গিক এক বিকল্প পথে বিশালতার সন্ধান করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। 'জলতিমির' সেই বিশালতাকে অঙ্গীকৃত করে এ সময়ের চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এক স্বর্ণখনিতুল্য উপন্যাস হয়ে ওঠে। কখনো আর্সেনিক সমস্যার কারণ এবং তা থেকে অব্যাহতির উপায় নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধকার প্রতিবেদন তো কখনো কথকতার ভঙ্গিতে বনবিবির কাহিনি আবার কখনো কালীয়দমনের মিথ বর্তমানকে সঙ্গে নিয়ে উপন্যাসে ওঠে আসে। উপন্যাসটিকে লেখক নিজে ডকু নভেল এর আখ্যা দিয়েছেন। ডকু নভেল হল যেখানে তথ্যসূত্রকে কাহিনির আকারে প্রকাশ করা হয় বটে কিন্তু তারই সঙ্গে তথ্যাতিরিক্ত এক চেতনার কথাও আসে, যেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে আলাদা আলাদা কিছু নেই, সব মিলেমিশে এক সময় অনির্দিষ্ট বোধের সৃষ্টি করে। যেখানে অনেক চরিত্র, তথ্য ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও অনেক। 'জলতিমির' উপন্যাসটিতে ডকু নভেলের এই সবকটি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিকে লেখক পাঠকের সামনে উপস্থিত করার জন্য চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে ডকুমেনটেশন বা তথ্যের উপর গুরুত্ব পড়েছে। আবার মিথকে পুনর্নির্মাণ করে প্রবাদের ব্যবহার করে খণ্ডকাল ছাড়িয়ে প্রবহমান মানবসত্তা যে হাজার হাজার বছরের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে তাকে স্পর্শ করেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় নিজে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসটির সম্বন্ধে বলেছেন—

'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে নিছক চরিত্র প্রকাশের তাগাদার বাইরে কিছু উপলক্ষ্যের মধ্যে বড় সময় অর্থাৎ জীবিত মানুষের জগতের বাইরে মানুষের

জগতের অবিন্যস্ত কিছু লক্ষণও পাওয়া যায় বলেই 'ডকু নভেল' সংজ্ঞাটি যুক্ত করলাম।[৬০]

—এই উক্তিটি তাঁর 'জলতিমির' সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। সেই সঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি সমালোচক অমিতাভ দাশগুপ্তের মন্তব্য—

'জলতিমির' পাঠ করতে করতে কখনও মনে হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানীর কখনও পরিবেশ বিজ্ঞানীর কখনও বা চিকিৎসকের ভাষ্য ও সিদ্ধান্ত ভর করেছে লেখাটিকে। মাঝেমাঝে এরকম আশঙ্কা জেগেছ যে, তথ্যের ভারে উপন্যাসের তৈরি তীরে পৌঁছানোর আগেই না ডুবে যায়। অথচ কাহিনীতে এই সব কিছুর যোগান দিয়েও লেখক শক্ত মুঠোয় নিয়ন্ত্রণ করেছেন একই সঙ্গে পাঁচটি ছুটে চলা ঘোড়ার লাগাম। নানা প্রক্রিয়ার রসায়নে আধুনিক উপন্যাসে যে কাট মেথড পদ্ধতির ব্যবহার হল, সেখানে মানুষের বিজ্ঞান যাতে পীড়িত ও আক্রান্ত মানুষের 'পুঁইয়ে খাওয়া' জীবন ও ঘর গেরস্থালি, তাদের ছোটো ছোটো সুখদুঃখ হাসি-কান্নাকে ছাপিয়ে না ওঠে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন লেখক। ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে আসা বিদেশী সমাজ কল্যাণব্রতীর সরেজমিনে তদন্তের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় দক্ষিণবাংলার বনবিবির পাঁচালি। ঘরে ঘরে বিষে ঢুলে পড়া মরণ থেকে পরিত্রাণকামী অথচ বিজ্ঞানবিহীন গ্রাম্যনরনারীর মানসিকতাকে তুলে ধরেন সাধন এভাবে—

'গল্প শেষ হলেও কী যেন শেষ হয় না। গগন ঢালি খানিক চুপচাপ বসে থেকে বলে ওঠে—কৈ হে মায়েরা, সিন্নি থাকে তো দাও। বাড়ি যাই। মেয়ে বউরা চুপ করে বসে থাকে। রাতটা যেন নির্বিশেষ একটি সময়খণ্ড হয়ে ওঠে, যেখানে সমস্ত জীবনের ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য আশা নিরাশা মহাসঙ্গমে মিলে মিশে মানুষগুলোকে বিশাল কোনও শক্তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'[৬১]

ভাষার ক্ষেত্রে লেখক প্রতিটি চরিত্রের মুখে চরিত্রানুগ ভাষার ব্যবহার করেছেন। যে ভাষা তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বিন্যাসটুকু ধরিয়ে দেয়। শ্রাবণে বৃষ্টি নামা ও না নামা নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ধরনের সংলাপ শুনতে পাই সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষের মুখে—

ক) '—পৃথিবীটাই বদলে যাচ্ছে, আবহাওয়ার দোষ কী।...

—যে যার খুশি মতো নিউক্লিয়ার টেস্ট করবে, আবহাওয়া বদলাবে না?

—সে তো চীনও করছে!

—আমেরিকা— ফ্রান্সেরগুলো চোখে পড়ল না? চের্নোবিল কি শুধু রাশিয়ানদেরই পঙ্গু করবে? তোমার শরীরে আঁচ লাগাবে না?[৬২]

খ) '—বললাম নতুন খড় চাপাও! নামে না......নামে না, তো বর্ষাখান নামলে আর রক্ষা আছে?

—পাপের দুনিয়া.......বর্ষা নামবে কেন?....তুই প্যানা পোট্‌গে যা!.....আমি খড় পাবো কৈ?'[৬৩]

শুধুমাত্র সংলাপে নয় কথকস্বরও ভাষার নৈপুণ্যে আমাদের জানিয়ে যায় অনেক কিছু। অখ্যাত গাঁয়ের ততোধিক অকিঞ্চিৎকর পরিবারের অন্নপূর্ণারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বা ইহলোক ত্যাগ করে না, তারা পট করে মরে যায়। কারণ সম্ভবত ওই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ বা ইহলোক ত্যাগ করার রোমান্টিকতা বাস্তবের রূঢ় পরিস্থিতিতে থাকে না। বরং মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত হয় 'টিত্যু' পঞ্চানন রবিদাশের মৃত্যু লেখকের বর্ণনায়—

'স্রেফ ইদুঁর ছুঁচোর মতো, মাঠের আলোর ধারে উল্টে পড়েছিল।...চূড়ান্ত শমন হাজির হওয়ার আগে সে খানিকটা দূরে বসে কেশেই যাচ্ছিল, সঙ্গে রক্ত! ...তারপর একসময়ে মাঠের রোদে শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে বুড়ো গা এলিয়ে দিতেই প্রাণখানি যে উড়ে যাবে, ছোকরারা অনুমান করতে পারেনি।...এ পাড়ায় মৃত্যু টিত্যু এমন অনাড়ম্বর ভাবেই ঘটে, যেন নিয়তিচক্রের গাছের পাতা টুপটাপ খসে যাওয়া।'[৬৪]

লেখক অনাড়ম্বর মৃত্যুর বর্ণনাও দেন নিরাসক্তভাবেই অহেতুক নাটকীয়তা ছাড়াই। আশ্চর্য হতে হয় লেখকের উপমার ব্যবহারগুলোতেও। উপরে উদ্ধৃত অংশটিতে পঞ্চাননের মৃত্যুর অনাড়ম্বরতা পরিস্ফুট করার জন্যে যে উপমাগুলো ব্যবহার হয়েছে সেগুলো স্বীকার করতেই হয় অত্যন্ত কৌশলী প্রয়োগ। এছাড়া প্রায় ভাঙা চেয়ারের উপমা হয়ে আসে 'দুর্ভিক্ষাক্রান্ত সোমালিয়ার কোনও শিশু'র ঝিম মেরে' থাকা (পৃ.১৭৭)। কালীদহের বিষবাষ্পে অসুস্থ হওয়া পাখির বর্ণনা দিতে গিয়ে আসে গালফ যুদ্ধে সমুদ্রের তেলগাদে ধ্বস্ত পাখির' (পৃ.১২০) উপমা। কেবল উপমার নিপুণ ব্যবহারের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের ক্ষুদ্র পরিসর ছাপিয়ে সম্পূর্ণ পৃথিবী আখ্যানে নিজের স্থান করে নেয়। আর যেন পাঠককে মনে করিয়ে দেয় উপন্যাস পাঠ কেবল অবসর বিনোদন নয়।

এছাড়া আর্সেনিক সমস্যার পুরো শিকড় সহ আখ্যানে তুলে আনার সময় লেখক কখনোই ভুলতে পারেননি যে এটি একটি আঞ্চলিক সমস্যা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপ্ত আর্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। তাই তাঁকে এ বিষয়টি আখ্যানে পরিস্ফুট করতে গিয়ে কখনো প্রাবন্ধিকের লেখনশৈলী আবার কখনো সাংবাদিকতার ঘরানা অনুসরণ করতে হয়েছে। আবার উপন্যাসের অন্বিষ্ট তো সময় সমাজ ও ইতিহাসধৃত ব্যক্তি মানুষ, তাই কেবল বিষয় নয় আঙ্গিক তৈরির সময় সেদিকেও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। আখ্যান সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য এ বিষয়ে তাঁর 'জলতিমির ঞ্জ প্রান্তিক পরিসর ও সামাজিক সময়' নামক প্রবন্ধে লিখেন—

> 'সাধন উপন্যাসের নিজস্ব ভাষা তৈরি করার ব্যাপারে শুরু থেকেই সচেতন ছিলেন। এই ভাষায় নান্দনিক মাত্রা নয় কেবল, খুঁজতে হয় সামাজিক দার্শনিক আর রাজনৈতিক মাত্রাও। আলাদা আলাদা ভাবে নয়, এক সঙ্গে কেননা নতুন ধরনের বহুত্বখচিত প্রতিবেদনে এই সব মাত্রার অন্তর্বয়ন নিয়ত উপস্থিত। এইজন্যে পাঠকৃতিতে দৈনন্দিন দেখা দেয় একেবারে অন্য মূর্তিতে, সুখ কিংবা বিষাদ সমগ্র জীবনের তুলনায় বিষমানুপাতিক ভাবে অতিরিক্ত পরিসর দখল করে না। অতীত ও বর্তমান, জীবন ও মৃত্যু, সংস্কার ও বিজ্ঞান, তথ্য ও দর্শন গানের স্থায়ী ও অন্তরায় মতো মিশে থাকে। আর তারই মধ্যে খুব কৌশলে উপন্যাসিক ছড়িয়ে দেন বিবর্তনহীন সময়ের অনুসঙ্গগুলি।'[৬৫]

আখ্যানকারে মুন্সীয়ানায় জলতিমির একই সঙ্গে বাস্তব ও রূপক, বর্তমান ও ঐতিহ্য, সংস্কার ও বিজ্ঞান, তথ্য ও দর্শনকে ধারণ করে হয়ে ওঠে খণ্ডকাল ও মহাসময়ের দ্বিরালাপের আখ্যান।

সাতপুরুষ ডট্ কম্

যন্ত্রশাসিত আজকের পৃথিবীতে সভ্যতার মানে কি নিষ্ঠুরতা, সম্পর্কহীনতা আর স্বার্থসিদ্ধির হীন চক্রান্ত এই প্রশ্ন প্রত্যেক বিবেকবান মানুষকে পীড়িত করছে। তাঁরা দেখছেন যন্ত্র প্রযুক্তির আস্ফালনের আড়ালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রতাপের দৃশ্য ও অদৃশ্য জাল। ভবিষ্যতের স্বপ্ন আকর্ষণ সব হারিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি সর্বস্ব বর্তমানে। স্বাভাবিক গতির অতিরিক্ত গতি আরোপ ও প্রগতির সঙ্গে তাল মেলানোর প্রচেষ্টা

এ দুয়ের ফলে মানুষ ক্রমাগত একা থেকে আরো একা হয়ে যাচ্ছে। জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আত্মবিনির্মাণ, মানবতাবোধ, সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা, সবধরণের দ্বিবাচনিকতা। নয়া উপনিবেশবাদ যন্ত্র প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে যে কোনো রকমের বৈচিত্র্যের ছাঁটাই করে সব একধরণের ছাঁচে ঢালতে চায়। এরকম সময়ে যে কোনো সাহিত্যিকের কাছে দুটো পথ খোলা থাকে— প্রথমত প্রতাপের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে মনোরঞ্জক সাহিত্য সৃষ্টি। যে সাহিত্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি মুছে নেবে মনোরঞ্জনের নেশার সাহায্যে। এ জাতীয় সাহিত্য মাদক দ্রব্যের সঙ্গে তুলনীয়। মাদক দ্রব্য যেমন মস্তিষ্কের সুস্থতা নষ্ট করে, তেমনি এ ধরনের সাহিত্য মানুষের স্বাধীন চিন্তন ও মনন শক্তিকে নষ্ট করে। দ্বিতীয় পথ হল এমন সাহিত্য রচনা করা যা মানুষের মনের সুপ্তিকে ভেঙে দেবে। এ পথ কঠিন কারণ, আজকের এই দ্বিচারী সময়ে মানুষের মন কেবল ঘুমন্ত নয়, অনেকে জেগে ঘুমানোর অভিনয়ে ব্যস্ত। যে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগানো যায়, কিন্তু যে জেগে থেকে ঘুমের অভিনয় করছে তাকে জাগানো সোজা কথা নয়। তাই দ্বিতীয় পথে পথিক লেখকদেরকে লেখায় ক্রমাগত শান দিতে হয়, কারণ লেখাই তাঁদের আয়ুধ। প্রাতিষ্ঠানিকতার বিপ্রতীপে, ছাঁচে ঢালা বিশ্বব্যাপ্ত সমান্তরালতার বাইরে তাঁরা প্রাকৃতায়ন ও উত্তরায়ণমনস্কতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান।

সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখক জীবনের প্রারম্ভ থেকেই দ্বিতীয় পথের পথিক — যিনি নিরন্তর সংগ্রামকে নিয়েছেন বেছে তাঁর সাহিত্য জীবনে। লেখা তাঁর কাছে সামাজিক দায়িত্ব। সত্তরের দশকে লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ করার পর বয়ে গেছে দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো কিছুই অপরিবর্তিত থাকে না, থাকতে পারে না— বিশেষত যাঁরা নিরন্তর আত্মবিনির্মাণ 'হয়ে ওঠা'র উপায় বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা যে নতুনের সন্ধানে ব্যস্ত থাকবেন তা বলা বাহুল্য। তাই 'সাত পুরুষ ডট্ কম্' (২০০৫)-এর সঙ্গে পূর্বালোচিত 'জলতিমির' (১৯৯৮)-এর রচনাপদ্ধতির যে বিশাল পার্থক্য লক্ষ্য করি তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। আখ্যানটির নাম থেকেই সাধন চট্টোপাধ্যায় বিনির্মাণ শুরু করেছেন যেন। আজকের বিশ্বজালে জড়ানো যে যন্ত্র সভ্যতা তাকে ব্যঙ্গ করেই নামটি রাখা হয়েছে। আখ্যানটির ব্লার্বে লেখা হয়েছে।

> 'এ এক আশ্চর্য আখ্যান। জমিদার নলিনীকুমার আদরের ঘোড়া হৈমিকে নিয়ে রওনা হয়েছিলেন কোলকাতায় ; উদ্দেশ্য কোম্পানী বাহাদুর আয়োজিত রেলপথ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের নিয়ম রক্ষা। কিন্তু হৈমি তাকে নিয়ে গেল অনেকদূরে। নলিনীকুমার যখন আগরপাড়ায় পৌঁছলেন এক গ্রিল বারান্দাওয়ালা বাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছিল তাঁর সাতপুরুষের বংশধর শশধর। এইভাবে মিশমার হয়েছে সময়ক্রম, এ দেশের নিজস্ব মিথ, ম্যাজিক, রাজনীতির ছোঁয়াচ পেয়ে গল্প ভাঙা গপ্পে রচিত হয়েছে বিচিত্র ওয়েবসাইট ঃ সাতপুরুষ ডট্ কম্ ।'[১]

প্রচ্ছদ পটের এই বর্ণনা যথার্থ। আখ্যানকার এ উপন্যাসে ভেঙে দিয়েছেন সময়ের বাঁধাধরা নিয়ম। অবশ্য সময় নিয়ে খেলা এবং জীবিত ও মৃতের ব্যবধান মিটিয়ে দেওয়া সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রিয় খেলা। ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'গুল্মলতার ইলেকট্রন'-এর প্রথম উপন্যাস 'শেষ রাতের শিয়াল'-এ জীবিত মানুষের পৃথিবীতে অনায়াসে প্রবেশ করেছে মৃত ব্যক্তিরা। হারিয়ে যাওয়া সোনাই নদীর খোঁজ একসময় যেন হয়ে ওঠে লুপ্ত সময়ের খোঁজ। বর্তমান অতীত একাকার হয়ে গেছে। 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'-এও অতীত এসে প্রবেশ করে বর্তমানে। আসলে আখ্যানকারের আদর্শ, চিন্তাভাবনা তাঁর দেখা এবং লেখাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এত খুব স্বাভাবিক। সাধন চট্টাপাধ্যায় 'কেন উপন্যাস লিখি' নামক একটি প্রবন্ধে তাঁর সময় ভাবনা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন এভাবে—

> 'ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে আসলে কিছু হয় না। ওগুলো সমাজে মানুষের কাজ চালানোর জন্য প্রতীক তৈরি করা। আমরা পুরোটাই বিস্তৃত একটা বর্তমানে বাস করি। আঁকিবুকি দিয়ে দাগ টেনে নিয়ে অতীত ভবিষ্যৎ ভাগ করে নেই।'[২]

এটুকু বলার পর আখ্যানকার আরো লিখেছেন যে সময় নিয়ে তাঁর এই বিশ্বাসটিকে রূপ দিতে গিয়েই 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'-এর জন্ম। একশ পৃষ্ঠার কম মাত্র ছিয়াশি পৃষ্ঠার এই উপন্যাসিকাটিতে সময়ের চলনটা সত্যিই অদ্ভুত। আখ্যান শুরু হয়েছে জমিদার নলিনীকুমারকে নিয়ে, সময় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ। খুব কম কথায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে তথাকথিত নবজাগরণ ও পরিবর্তনের হওয়া নানাশ্রেণীর ভারতবাসীর মনে কি ছাপ ফেলেছিল তা জানতে চাইলে 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'-এর প্রথম পরিচ্ছেদটি পড়তে হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাধন চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা দিয়েছেন উনিশ শতকের মধ্য ভাগের জীবনের টুকরো টুকরো ছবি, তাদের মানসিক গতিবিধির। তারপরের পরিচ্ছেদেই সময় একুশ শতক— আর কুশীলব নলিনীকুমারের অধস্তন সপ্তমপুরুষ শশধর আর স্বয়ং নলিনীকুমার। তিন প্রহর আর দুদণ্ড ঘোড়ায় চড়ে পনেরো ক্রোশ অতিক্রম করে নলিনীকুমার এসে পৌঁছেছেন দেড় শতাব্দী পরের এক মফস্বলে। একুশ শতকের প্রথম দশকে মহানগরের উপকণ্ঠে থাকা শহরেও মহানগরের ব্যস্ততার, ছোঁয়া লেগেছে। সাফল্যের ইদুঁর-দৌড়ে সবাই সামিল। বৃদ্ধ শশধরের দুই পুত্র একে অপরের শত্রু। এই ঘটনাগুলোর যখন বর্ণনা দেখি, তখনই অন্যদিকে দেখি নলিনীকুমারের আগমনে শশধর তাঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন, তাঁর যাত্রাসঙ্গী হয়ে পাঁচমুড়া পর্যন্ত যাচ্ছেন। উর্ধতন সপ্তমপুরুষটির সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোতেই সময় আবার পৌঁছে যাচ্ছে দেড়শ বছর পরে। এ আবার সেই সময় যখন প্রথম রেল গাড়ি চলবে বঙ্গদেশে, যখন কিছুদিন আগেই জলপথ ও স্থলপথকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। এভাবে দুটো সময় পাশাপাশি বয়ে চলে। আর এই দুই পাশাপাশি

বয়ে যাওয়া সময়কে জুড়ে রেখেছেন শশধর। অতীত আর বর্তমানের একসঙ্গে বয়ে চলা সত্যিই অভিনব। এমনকি অতীত বলে যাকে উল্লেখ করছি তা তারিখের হিসেবে ১৮৫৪ সালে হলেও রচনা বৈশিষ্ট্যের জন্য তাও হয়ে দাঁড়ায় বর্তমান। সাধন চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

> ‘যে-কোনো আখ্যানের মূল দায়িত্ব হল এক বা একাধিক স্পেসে পাঠকদের চালিত করা। সময় সম্পর্কেও একই কথা। সব আখ্যানই অতীতের, কিন্তু পাঠকের কাছে তা বর্তমান হয়ে যায়। যখন সময়ের নানা টুকরোর জোড়াতালি আখ্যানে প্লটের শরীরে মূল জানা হিসেবে পরানো যায় না, কোনো লেখক ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতি নেন, কেউ কেউ সময়কে নিয়ে এমন সম্মোহন খেলায় মাতেন, সময়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, কোনো অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না।’[৩]

এ কথা তো যথার্থ যে মুহূর্তে কোনো কিছু লেখা হচ্ছে পরমুহূর্তেই তা হয়ে যাচ্ছে অতীত। আর অতীতের কোনো ঘটনা অথবা বিষয়ই অভিজ্ঞতা আর মতাদর্শের রসে জারিত করে সাহিত্যকার তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ করেন। সে-অতীত হয়তো নিকট অতীত অথবা সুদূর অতীত। কিন্তু যদি দুটো সময়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মনে হয় প্রায় এক তবে কেন তাদের একত্রিত করে দেওয়া যাবে না? ‘সাতপুরুষ ডট্ কম্’-এ যে দুটো সময় জুড়ে গেছে এসে একসঙ্গে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য প্রচুর অমিলের মধ্যেও অবাক করার মতো। দেড় শতকের ব্যবধান সত্ত্বেও দুটো সময়ের যে মিল আছে তা এভাবে বলা যেতে পারে—ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শাসকগোষ্ঠীরা যখন রেলপথ নির্মাণ করছিল তার পেছনে তাদের মূল লক্ষ্য শাসিত দেশের সম্পদ কুক্ষিগত করা। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পেছনে রাজনৈতিক কারণ অবশ্যই ছিল, কিন্তু বণিকের হাতে যখন রাজদণ্ড ওঠে তখনও সে বাণিজ্যিক দিককেই যে প্রাধান্য দেবে তাতে আর সন্দেহ কী? আর জনগণের হিত সাধন যে তাদের চিন্তার মধ্যে কখনোই ছিল না রেলপথ নির্মাণের পেছনে তাও বলা বাহুল্য। সাধন চট্টোপাধ্যায় সাবলীল মুন্সীয়ানায় বিষয়টিকে আখ্যান তুলে ধরেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গে রেল চালানোর আগে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই থেকে থানে ভারতের প্রথম রেল চলাচল শুরু হয়। গ্রেট পেনিনসুলা নামক কোম্পানি এই রেল চালু করে। দুই কোম্পানির প্রতিযোগিতার সূত্রে চলে আসে রেলপথ স্থাপনের পেছনে যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য তার বিবরণ—

> ‘আজ এই ট্রায়াল রান এর চার পাঁচ মাসের মধ্যে আমরা কালো হীরের দেশে পৌঁছে যাব। ওখানে মাটির নিচে আমাদের ভাগ্যে কোটি কোটি পাউণ্ড অপেক্ষা করছে। কেবলমাত্র আমাদের জন্য। গ্রেট পেনিনসুলার সে সুযোগ কৈ?

> কিন্তু ওখানে ওরা যে শষ্যদানা তুলে নিতে পারবে? সাহেবটি সহজেই হেসে বল্লেন, এখানেই বা তার অভাব কি?'[৪]

ফরাসীদের সঙ্গে বৃটিশদের শত্রুতা বহুপুরানো। ইতিহাসের নানা বাঁকে এই শত্রুতার নানা কারণ লুকানো আছে। দুই উপনিবেশকারী জাতি ভারতবর্ষেও তাদের শত্রুতা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল চন্দননগর হয়ে রেলপথ স্থাপনের প্রয়োজন হলে নিজেদের অর্থনৈতিক লাভালাভের কথা ভেবে ইংরেজরা সাময়িকভাবে নতি স্বীকার করে চুক্তিপত্র তৈরি করে। তাদের লক্ষ্যকে সাধন চট্টোপাধ্যায় মিসেস কেলি নামক এক চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন—

> 'রাণীর নামে শপথ নিয়ে বলছি, ওদের কাছে আপাত মাথা ঝোঁকালে, যদি আমরা প্র্যাকটিকাল হই, খনি আর ফসলের কোটি কোটি পাউণ্ডের সম্ভাবনা অনেক বেশি শক্তি দেবে আমাদের। ভবিষ্যতই সব নির্ধারণ করে দেবে চূড়ান্ত ভাবে।'[৫]

অর্থাৎ অর্থের জন্যে রেলপথ, সাময়িক সন্ধি সবই চলতে পারে। ঔপনিবেশিক দেশগুলোর সব কাজের পেছনে মূলত নিজেদের সমৃদ্ধি চিন্তাই কাজ করত। দেড়শ বছর পর পৃথিবীর প্রায় সব দেশগুলোই যখন ঔপনিবেশিক শোষণ এবং শাসন থেকে মুক্তি লাভ করেছে তখন প্রবল হতাশার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি সাম্রাজ্যবাদ ভোল পাল্টে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর। বিজ্ঞাপনের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার তৈরি করা হয়। আর সেই বাজারকে আরো মোহিত করার জন্যে প্রয়োজন হয় বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার। সেইসঙ্গে ঠিক একই কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে বিশ্বসুন্দরী মনোনিত হয় বেশি। লক্ষ্য এখানেও সেই মুনাফা অর্জন। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে এত ব্যাপকহারে তৃণমূল পর্যায়েও তাই দেখি মফস্বল, ছোটো প্রত্যন্ত শহরেও সুন্দরী প্রতিযোগিতার চল শুরু হয়েছে। 'সাত পুরুষ ডট্ কম্'-এ শশধরের ছেলে সুলক্ষণ সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সাধন চট্টোপাধ্যায় কার্নিভালের আমেজ নিয়ে আসেন রচনা পদ্ধতিতে— যেখানে দেখি, যে বেসরকারি সংস্থা সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে আগড়পাড়ায় তাদের প্রধান উদ্দেশ্য— 'সকলের জন্য শিক্ষা ও সমাজের অর্থনৈতিক পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি' (পৃ.৬৫)। সমাজের অনগ্রসর মানুষদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা নয়, তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টাও নয়, তাদের মধ্যে সৌন্দর্য বোধ সৃষ্টির কাজ করা সংস্থার লক্ষ্য! আর সেই লক্ষ্যের উপায় সুন্দরী প্রতিযোগিতা। ব্যঙ্গের কষাঘাতে কথাকার যেন পাঠককুলকে সচেতন করতে চান। আগড়পাড়াতে কেন এমন উৎসব তার উত্তর সভাপতি কেডিয়া নানা প্রেস মিটে জানিয়েছে—

‘... স্পনসররা চাচ্ছেন।

কেন চাচ্ছেন?

তা ওদের ব্যাপার।

কখনো বা উত্তর তৈরি হয়েছে, মানুষের মনের ক্ষুধা কি শুধুই কলকাতায়? পুত্তর মানুষরা ভোট টোট কি দেয় না?

ভোটের সঙ্গে এর সম্পর্ক?

কেডিয়া হেসে বলেছিলেন, আমি ওটা সংখ্যার জন্য বলছিলাম।

সংখ্যা? সংখ্যা দিয়ে কী হবে?

কী না হবে বলুন?

কয়েকটি স্থানীয় কাগজ কলম বিষয়টার পেছনে বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজারের কালোহাত দেখতে শুরু করল, কেডিয়া প্রথম দলা পাকিয়ে কাগজগুলো ছুঁড়ে দিলেন।

এরা রামায়ণ মোহাভারতের মধ্যেও বিশ্বায়ন দেখতে পাবে... কারণ ওগুলো যে খুবই জনপ্রিয়।

আসলে সমস্ত পৌরাঞ্চল জুড়ে, ব্যবসায়ের রমরমা বাতাবরণ। দু দুটো শাড়ি গারমেন্ট-এর এ সি শপিং কমপ্লেক্স দেশের যে কোনো প্রান্তের শো-রুমকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এদের মোট ক্যাপিটাল কোটি কোটি টাকা। প্রসাধনা, স্বর্ণালংকার এবং ফার্নিচারের এত বড় বাজার সারা মহকুমাতে নেই। বলতে গেলে, স্টেশন রাস্তাটাই মাতিয়ে রেখেছে সাড়ে তিন লাখের জনজীবনকে। এ রাস্তায় সন্ধে রাত দশটা অবধি পুরুষ নারীর ঠোকাঠুকি ও চোখ-কানে তাদের বস্তুবাদী টান দেখলেই আন্দাজ হয়, বাজার ও বিজ্ঞাপনের প্রবেশপথ কেবলমাত্র চোখ এবং কান।’ [৬]

ভোগবাদকে এভাবে হাতিয়ার করে নয়া ঔপনিবেশবাদ তার অবাধ সাম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। আর যদি কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় তাহলে কুযুক্তি অথবা বলপ্রয়োগ করে সবধরনের প্রতিবাদকে স্তব্ধ

করার চেষ্টা শুরু হয়।

সম্পূর্ণ আখ্যানে নন্দিনী বোস চরিত্রটা এক রহস্যময়ী চরিত্র। তার অতীতের খবরও স্পষ্ট নয় আর ভবিষ্যতের খবরও অন্যের মাধ্যমে জানানো কুয়াশাচ্ছন্ন। লক্ষৌ-এ তার খানিকটা ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। দিল্লীতে তার ক্ষমতার কেন্দ্র। সিমলায় বোডিং-এ ছেলে থাকে। তার স্বামী ঠিক কে দুবছরেও সঠিক জানতে পারেনি সুলক্ষণ। ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানি তারই মস্তিষ্ক প্রসূত। এই কোম্পানির কাজ 'ডবল এক্স ছবির কাঁচা ম্যাটেরিয়াল থেকে শুরু করে মুম্বই-দিল্লী মেয়েদের পাঠানো...কী হয় না?' (৩৯২)/ সেই নন্দিনীর কাছ থেকে তুষার চায় নানা গোপন তথ্য, যাতে ছোট ভাই সুলক্ষণকে ফাঁদে ফেলা যায়। আবার সুলক্ষণ এই গোপন আঁতাত আঁচ করেও নন্দিনীর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। কারণ, নন্দিনীই জোগাড় করবে সুন্দরী প্রতিযোগিতার স্পনসর। কিন্তু আখ্যানের শেষে তুষার নন্দিনী সম্বন্ধে যে তথ্য দিয়েছে তা চরিত্রটিকে যথার্থ চিনতে সাহায্য করে। ছেলে পপুর কাছে সিমলায় যাওয়ার নাম করে নন্দিনী আগড়পাড়া ছাড়ে। কিন্তু আসলে রচিত হয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র—

> 'এ সম্পত্তিতে বিদেশী আশ্রম হবে... যোগাশ্রম... ফ্লোরিডা থেকে বিটার প্লিৎজ্ সিমলায় ওর সঙ্গে দেখা করে গেছে ইদানীং... ডিল খতম।... আন্তর্জাতিক ক্ষমতা...।' [৭]

উপনিবেশকারীরা দেশের স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশের কাঁচামাল নিয়ে নিজেদের দেশে নানা দ্রব্য তৈরি করে আবার আমাদের দেশেই অধিক মূল্যে বিক্রি করত। আর এখন দেখছি আমাদের দেশের নিম, বাসমতি চালের পেটেন্ট নিচ্ছে বিদেশি রাষ্ট্র। আবার যোগ—যা সম্পূর্ণ ভারতীয়, তা আজ বিদেশিদের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিদেশি যোগাশ্রম তৈরি করার জন্যে জমি অধিগ্রহণ হবে তাও বেআইনিভাবে। নিরুপায় উচ্চারণ কেবল তুষারের নয়, যে কোনো ক্ষমতার বলয়ের বাইরে দাঁড়ানোর মানুষের— 'বে আইনটা আইনের চোখে সাধু বনতে কতক্ষণ?' (পৃ.৮৫)।

অন্যদিকে সুলক্ষণ ও তুষার দুজনেই নিজের মতো করে চেষ্টা করছে ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছানোর। তাদের পূর্বপুরুষ নলিনীকুমারও তো ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রের খুব কাছে— এই নেশা তো তাদের রক্তে। প্রতিযোগিতা আর স্বার্থ তাদের এতটাই গ্রাস করেছে, যে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনে তারাও হাত মেলায়। এই শিক্ষা তো আধুনিকতার শিক্ষা-যেখানে স্বার্থের জন্যেই বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতা।

আধুনিকতার আরেকটি শিক্ষা হল পুরানোকে পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া। আধুনিকতাবাদের

আগমনে বাংলা সাহিত্যে ঘটে গেছিল শিকড় থেকে উচ্ছেদ, ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি। নীলকুঠির সাহেব স্টিফেন রেলে এবং রেলের সিগন্যালারের অস্ট্রেলিয়ান মিক্সটবিড্ ঘোড়ায় চাপার পর নিজের ঘোড়াটিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। গতির পৃথিবীতে সামান্যতম পিছিয়ে পড়াও সে বরদাস্ত করতে পারেনা এবং সে বিশ্বাস করে বাতিলের অধিকার তার আছে। সে বলে—

> 'গতি ! গতি !...কোনো দরকার সেই তোর। বাতিল।... আমার হক আছে...
> বাতিলের অধিকার আছে...' [৮]

এখন তো নিজেদের মা-বাবাকেই বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে— সময়ের দোহাই দিয়ে। বৃদ্ধ শশধর নিজের বাড়ির এককোণে পড়ে থাকেন-কাজের মানুষের ভরসায়। নাতি-নাতনিরা তো আসেইনা— দুই ছেলেও খোঁজ খবর নিতে আসেনা। অসুস্থ পিতার সুস্থতা তাদের প্রয়োজন কেবল সম্পত্তির কাগজপত্রে সই করানোর জন্যে। এমনকি ডাক্তাররা শশধরকে মৃত ঘোষণা করলেও ভেন্টিলেশনে তার হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা চালু রাখা হয় সম্পত্তির হিসেব নিকেশের বোঝাপড়া করার জন্যে। আধুনিক থেকে আধুনিকতর হওয়ার প্রচেষ্টা এভাবে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে একাকিত্বের অন্ধকূপে।

যে রেলপথের উদ্বোধনের কথা থেকে এ আখ্যানের প্রারম্ভ সেই রেলপথ ও রেল গাড়ি নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নানা শ্রেণীর চিন্তাভাবনা আখ্যানকার তুলে ধরেছেন। নতুন কিছু শুরু হলে তার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা ধরনের কথা তৈরি হতে থাকে— এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সবচেয়ে মর্মস্পর্শী মন্তব্য—

> 'তিথি নক্ষত্রের ফারাক হবে ? যা দিনকাল পড়েছে এমনিতেই হাজারো অশান্তি...
> আমি দু-দুবছর খুশিমতো চাষ দিতে পাচ্ছিনা, কেবল নীল বুনতে হচ্ছে, দশঘর
> প্রজা কেঁদেকেটে এক শা !... এর মধ্যে সেধে এ উৎপাত কেন ? আমাদের ঐ
> গাড়ি চড়ে লাভ ?' [৯]

এই প্রসঙ্গে কি মনে পড়ে যায় না, বর্তমানের বড়ো বড়ো শপিংমল, বিলাসবহুল গাড়ি, রেলের কথা। ধনীর জন্যে তৈরি এই জিনিসগুলি গরীবদের কোন কাজে লাগে ? যারা দু'বেলা খেতে পায় না তাদের কীই বা প্রয়োজন বিলাসের এই আয়োজন ? এই সব বিষয়গুলি দেড় দশকের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। সময়ের এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাযুজ্য তা সত্যিই অবাক করার মতো। সাধন চট্টোপাধ্যায় দুটো সময়কে ভাঁজ করে পাশাপাশি নিয়ে এসে পাঠকদের ভাবতে বাধ্য করেন এ কোন সময়ে আমাদের অবস্থান ? আমরা কি যথার্থই সভ্যতার প্রগতির পথে হাঁটছি নাকি প্রথম বিশ্বের দেশগুলো

প্রদর্শিত পথে হেঁটে চলেছি অদৃশ্য গোলামির জোয়াল কাঁধে নিয়ে।

ল্যাতিন আমেরিকার লেখকরা তাঁদের দেশের দুর্বিষহ বাস্তবের অচলায়তনকে ভেঙে দেওয়ার জন্য লেখায় নিয়ে এসেছিলেন প্রকল্পনা বা ফ্যান্টাসি। ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার প্রয়োগ করে তাঁরা চিরপরিচিত জগৎকে করে তুলেন রহস্যময়, মায়াময়। কিন্তু একথাও লক্ষণীয় যে, তা কখনোই বাস্তব থেকে পলায়ন নয়। আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক দেশগুলোর প্রমাণিত বাস্তব থেকে, তাদের ভাবাদর্শগত বলয় থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ল্যাতিন আমেরিকার লেখকদেরে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের আখ্যানে এক বিকল্প জগৎ নির্মাণের। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই নব্য ধারাটি বিকশিত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্য বিশ শতকের শেষ দিকে নানা সাহিত্যিকের কলমে এই আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনা একটা দেশিয় রূপ পায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটি কিন্তু সম্পূর্ণ বহিরাগত নয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 'কঙ্কাবতী', 'ডমরুচরিত', 'ভূত ও মানুষ' ইত্যাদি আখ্যানে বানিয়ে তোলা কাহিনিকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। কার্নিভালের অট্টহাস্য অথবা পশু-মানুষ, জীবিত মৃতের ব্যবধান মিটিয়ে দিয়ে এক নতুন রীতির প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আধুনিকতাবাদপুষ্ট উচ্চসংস্কৃতির দাপটে ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রচেষ্টা একঘরে হয়েই রয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁর লেখাকে যথাযোগ্য সম্মান জানাননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে কয়েকটি অতিপ্রাকৃত গল্পে অপর বাস্তবতার অবতারণা করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসে লোকয়ত বিশ্বাস মিথের উপস্থাপনা আধুনিকতাবাদী বাস্তব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরাজ্যে নিয়ে যায় যেন। তবে ব্যাপকতর ভাবে এবং তত্ত্বগতদিকটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সত্তরের দশকের বাঙালি লেখকরা জাদুবাস্তবতাকে তাঁদের লেখায় এনেছেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটির এ্যান্টেনা', 'গুল্মলতার ইলেকট্রন', শেষরাতের শিয়াল', 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'-এর মতো উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'-এর অতীত আর ভবিষ্যতের দেওয়াল ভেঙে গেছে এক আশ্চর্য ফ্যান্টাসির সাহায্যে। বাস্তব ও কল্পজগতের অন্তর্বয়নে এক অভিনব সাহিত্যকৃতি আমরা পেয়ে যাই। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য 'এ সময়ের আখ্যান' প্রবন্ধে এই আখ্যানটি সম্পর্কে তাই বলেন—

> 'সাধন চট্টোপাধ্যায় যখন 'সাতপুরুষ ডট্ কম্'-এ পাঠকদের নিয়ে দুটি জগতে সঞ্চরণ করেন এবং আখ্যান কোনও স্তরেই স্থির থাকে না, আমাদেরও মনে হয় যে কথাকার ঐ 'Hour of zero gravity'-ই খুঁজেছেন।'[১০]

অতি সহজেই সাত প্রজন্মের ব্যবধান ঘুচে যায়। শশধরের 'ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার বাপ' নলিনীকুমার

শশধরের বাড়িতে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হন। পলিত কেশ নলিনীকুমার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যৌবন প্রাপ্ত হতে থাকেন। সময়ের উল্টো ধারার কথা সাধন এভাবে জানান—

> 'শশধর এ-যাত্রা অধিক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে, ঢুকবার কালের তুলনায় বর্তমানের 'উনি' অনেক তরুণ হয়ে গেছেন। চুনোট ধুতি, চাপগান, পাঁসনে, চেনবাঁধা পকেট ঘড়ি। গোঁফ ও কুচকুচে চাপদাড়ি। সমৃদ্ধ বনেদি দৃষ্টির ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু বিস্ময় বোধ করছ?
>
> না, মানে, আসলে.....।
>
> হ্যাঁ, সেই আমি-ই। ওটা ছিল পড়ন্ত বেলার ভবিষ্যৎ চেহারা।.... আগাম না হয় দেখেই রাখলে।.... এখন সবে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মেছে... এরপর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে মেজপুত্র আসবে অশ্বিনীকুমার... তার মধ্যম সন্তান আনন্দকুমার... তারপর ধৃতিকুমার... তারপর নবীন... নইলে তোমার আসার পথ খোলে কী করে?' [১১]

আর এই নামগুলো শশধরের স্মৃতির উৎসমুখ খোলে দেয়। প্রপিতামহ আনন্দকুমারের কথা তাঁর মনে পড়ে। যিনি তাঁকে শেখাতেন বংশ পরিচয়, ব্রাহ্মণ হিসেবে জাত্যাভিমান। যিনি প্রপৌত্রকে ডাকতেন 'বাবা', আর সামান্যতম পীড়ায় ইষ্টদেবতার স্তবে ঝাড় ফুঁক করতেন ছোট নসুর। শশধরের মনে পড়ে যায় অকালমৃত পিতামহের কথা। যাঁকে তিনি দেখেননি, যাঁর মৃত্যু হয়েছিল সন্ন্যাস রোগে। স্নানের সময় পুকুরের নেমেছিলেন, সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। সময় এভাবে ঠিক কোন পথে হাঁটছে বোঝা যায় না পুরো তাল গোল পাকিয়ে গেছে মনে হয়। স্মৃতি হাঁটছে পেছন পথে, যাঁকে কেন্দ্র করে এই স্মৃতি রোমন্থন সুদূর অতীতের সেই ব্যক্তি বর্তমানে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছেন।

একুশ শতকের যন্ত্রপ্রযুক্তি সর্বস্ব যুক্তিবাদের গণ্ডিতে আবদ্ধ রুদ্ধ বাস্তবে নতুন বিন্যাসের খোঁজে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকদেরে অধিবাস্তবের সাহায্য নিতে হয়। আসলে রূঢ় এই বাস্তবই তাঁদের ভাষাকে ইন্দ্রজাল নিষ্ণাত করে তোলে। বাংলা সাহিত্যে বা বলা চলে বিশ্ব সাহিত্যের কোষে কোষে কেন সঞ্চারিত হচ্ছে বাস্তবের অধিক ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার ছোঁয়া তা তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য 'ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা অথবা বাস্তবের ইন্দ্রজাল' নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> 'আধুনিকোত্তরবাদী নির্মানবায়ন ও কুহকী পণ্যায়নের মোকাবিলা করার জন্যে কথাকারেরা ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার প্রয়োগ কৌশলকে নিছক কাহিনির প্রযুক্তি

বলে ভাবছেন না। এ আসলে বিশ্বাস ও আস্থা পুনরুজ্জীবনের দার্শনিক বীক্ষাভূমিও। ধ্বংস ও নৈরাজ্য ও মৃত্যুর কুহকী বলয়ের স্পর্ধাকে কথাকারেরা বহুমাত্রিক ও বহুস্বরিক নব্য ইন্দ্রজাল দিয়ে প্রতিহত করতে চাইছেন। যেন আমাদের ফিরিয়ে দিতে চাইছেন নতুন আরম্ভের প্রতিশ্রুতি! 'আমার ভিতরে আছে সর্বাঙ্গরঙীন পথগুলি তাতে সব হবে।' অস্তমিত বিশ শতকের অন্যতম পুরোধা কথাকার ইতালো ক্যালভিনো তাঁর 'Six memos for the next millennium' বইয়ের উপসংহারে যে অসামান্য উচ্চারণ করেছিলেন, তা হতে পারে এই নিবন্ধেও আপাত সমাপ্তি-বিন্দু ঃ 'Who are we, who is each one of us, if not a combination of experiences, information, books, we have read, things imagined? Each life is our encyclopedia, a library, an inventory of objects, a series of styles and everything can be constantly shuffled and reordered in every way conceivable.' (১৯৯৩/১২৪)।'[১২]

সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখছেন বৃদ্ধ পিতাকে গৃহবন্দী করে রেখে সম্পত্তির জন্য সন্তানরা গজকচ্ছপের লড়াই-এ মগ্ন, দেখেছেন পিতা মাতার ভাগ্যে অপেক্ষা করছে বৃদ্ধাশ্রম, দেখছেন পুরনো 'কনসেপ্টগুলোকে' উপড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে শেকড়শুদ্ধ আবার দেখছেন প্রাচীন সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যের নানা তত্ত্বকে ব্যবসাদাররা ব্যবহার করছে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী। সাহিত্য থেকে সিনেমা, বিজ্ঞাপন থেকে চিত্রকলা — চারুশিল্পের সবকিছুতেই এ জাতীয় চাতুরি লক্ষ করা যায়। মানুষের আদিম একটা প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করা শিল্পে চটজলদি দৃষ্টি আকর্ষণের সোজা উপায়। সেই জন্যে সাহিত্য থেকে শুরু করে যে কোনো চারুকলার সর্বত্র যৌন আবেদন ঢুকিয়ে দেওয়া একটি পুরনো রীতি। আর বর্তমানে যা হচ্ছে তা হল যৌনতাকে ব্যবহার করার সময় তাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে নানা 'জ্ঞান'। তাই মধ্যবিত্ত ও সামান্য উচ্চবিত্তদেরে লক্ষ করে বানানো বিজ্ঞাপনে প্রচুর যৌন-আবেদন দেওয়া হচ্ছে আর সঙ্গে থাকছে 'ফ্রয়েড, হ্যাবলক এলিস থেকে বাৎসায়ন, ভারতীয় সমাজ, মদনভস্ম, শিবলিঙ্গ, গৌরীপটের মিথ, বিপরীত বিহারের ধর্মীয় প্রতীক' (পৃ. ১৫) — প্রভৃতির মিশ্রণে সারবান এক প্রাসঙ্গিকতা। সাধন চট্টোপাধ্যায় আরো দেখছেন নামীদামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভালো ছাত্রছাত্রীরাও কুসংসর্গে পড়ে বিপথে পা বাড়াচ্ছে, দেখছেন এক কালের প্রান্তিকায়িতের অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখা মানুষগুলো প্রতাপের কাছে মাথা মুড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, দেখছেন পিতার সুস্থতা কামনা সন্তানরা করে ভালোবাসার জন্যে নয়,

সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার জন্যে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যাওয়া এই অসুখ দেখে কোনো সৎকথাকার চুপ থাকতে পারেন না, সাধন চট্টোপাধ্যায়ও পারেননি। ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন এসব। আর এসব কিছুর পাশাপাশি যে বিষয়টি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে আমাদের ঔপনিবেশিক মনের কাঠামো। আর আখ্যানে এগুলো সব আনার জন্যে তাঁকে সাহায্য নিতে হয়েছে কল্পনার। কল্পনা যেখানে প্রকল্পনার ছোঁয়ায় রঙিন। লেখক একটি প্রবন্ধে জানান—

> ‘কল্পনায় এসেছিল, প্রথম যেদিন হাওড়া থেকে চুঁচড়ো অবধি রেলগাড়ি চলে, বিশিষ্ট যাত্রী হিসেবে প্রথম দিনের যাত্রার, বেশ কিছু দিশি জমিদার — তালুকদার সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি আবেদন করেছিলেন। সকলকে অনুমোদন দেয়া যায়নি। যে-ক’জন ভাগ্যবান সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন বসিরহাটের এক জমিদার আগের দিন বিকেলে রওনা হয়ে উপস্থিত হলেন বর্তমান আগরপাড়ায় তাঁর সপ্তম অধস্তন এক বংশধরের বাড়িতে। রাতটা কাটিয়ে পানসিতে গিয়ে সোজা উঠবেন হাওড়ায়। এ-ভাবেই দুই আপাত আলাদা-আলাদা কালখণ্ডকে একটি বর্তমানে মিশিয়ে, রেলযাত্রা ও রাতে আনন্দ ফূর্তি করিয়ে পরদিন ফিরিয়ে আনার মধ্যে দেখাতে চেয়েছিলাম আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ভূমিতে আড়াইশ বছরের ঔপনিবেশিকতা। তার শাসনে গড়া আমাদের মনের কাঠামোটি। যা আজও, নয়া ঔপনিবেশিক সমাজে মুক্ত স্বাধীন তো হয়নি, নব কলেবরে শক্তি বৃদ্ধি করছে।’[১৩]

লেখক, যদিও একবার লিখে নেওয়ার পর তাঁর অবস্থান পাঠকদের সঙ্গেই। তাঁর লেখা সম্বন্ধে মতামত একজন পাঠকের মতামত হিসেবেই ধরা হবে। কিন্তু এখানে সাধন চট্টোপাধ্যায় ঠিক কোন মানসিকতা নিয়ে লিখেছিলেন, তা প্রকাশ করছেন। তাই কথাটি অবশ্যই একটু বিশেষ অভিনিবেশের দাবি রাখে। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন আমাদের মানসিকতায় থেকে যাওয়া গোলামির স্বভাব — যা আজও পুরো মুক্ত হয়নি। আর তা দেখানোর জন্য কাহিনি বা না-কাহিনির অবতারণা। বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিক তাই সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায়। বিষয়কে কীভাবে উপন্যাসায়িত করা হবে তা ঔপন্যাসিকের ভাবাদর্শ, চিন্তাধারার ওপর নির্ভর করে। কখনো কাহিনির আপাত আড়ালে গভীরতর সত্য প্রকাশিত হয়। কখনো গল্প আর না-গল্প এগিয়ে চলে সমান্তরালে। কখনো ভাষায় মায়াময় এক আবেশ সৃষ্টি করেন কোনো সাহিত্যিক তো আবার অন্য কোনো লেখক কাটাকাটা বাক্য বিন্যাসে, অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখায় গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যান না গল্পের ধাক্কায়। ‘সাতপুরুষ ডট্ কম’-এ প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে সফলভাবে।

আঙ্গিক ও বিষয় দুটোকেই সমৃদ্ধ করেছে প্রতীকের এই সার্থক সন্নিবেশ। খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাস জানানো সম্ভব হয়েছে ভাষায় চিহ্ন ও প্রতীকের ব্যবহারের জন্য। জমিদার নলিনীকুমার ও নীলকুঠির মালিক স্টিফেনের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব নেই, একে অপরকে 'বন্ধু' হিসেবে সম্বোধন করেন। কিন্তু নলিনীকুমার যখন 'বন্ধু'কে একটি 'অনুরোধ' করে, তখন তার ইংলিশ করে নেয় স্টিফেন 'প্রেয়ার' হিসেবে। ঔপনিবেশিক প্রভুরা বন্ধুর সমান আসনে শাসিত দেশের কোনো ব্যক্তিকে বসালেও মর্যাদায় তারা উচ্চ — তা কি তারা ভুলেছিল কখনো? আবার রেল লাইন পাতার প্রসঙ্গে এক জায়গায় সাধন জানাচ্ছেন — 'মানুষ জ্ঞানের গর্বে ক্রমাগত নতুন নতুন উদ্ভট পরিবর্তনের কথা বললে, ফল হবে বিষময়' (পৃ. ৫)। এই কথাটি যেন রেলের প্রচলনের প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে অনেক ব্যাপক হয়ে পড়ে, যখন আমরা দেখি বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার জীবনকে গতিময় আরামদায়ক করার সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতাকে তথা সম্পূর্ণ পৃথিবীকেই দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে প্রশ্নচিহ্নের সামনে।

প্রতাপের সামনে মাথা ঝোঁকানোর মনোবৃত্তি দুশো বছরের গোলামির শিক্ষাই হয়তো। ব্ল্যাকবার্ড, এ্যাডভেটাইজিং কোম্পানির সম্পাদক, সোমনাথের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল, আদিবাসী অভ্যুত্থানে যোগ দেয় কিন্তু '৩৫ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' তাদের প্রচেষ্টাকে গুঁড়িয়ে দেয়। নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্যে এখন সে সুলক্ষণের কোম্পানিতে কাজ নিয়েছে বন্দুক ফেলে। আবার এখানে লক্ষ করার মতো যে দেশের 'উলঙ্গ মেয়েছেলে' —

> 'জঙ্গল বেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে ... সামান্য কিছু পচা বাঁশের জন্য ... স্রেফ খাবে বলে ... নিজের খিদেয় নয় ... পেটের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে ...' [১৪]

সেই দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে খরচ হয় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। আর নিজেদের ক্ষুধার অন্নের জন্যে সংগ্রামে গেলে তারই উপর প্রয়োগ করা হয় এক বিরাট অংকের টাকা, কিন্তু তার ক্ষুধা মেটানোর জন্যে নয়, তার বিদ্রোহ শেষ করার জন্যে। তাই অন্য প্রসঙ্গে সাধন আবার আমাদের জানিয়ে রাখেন — 'প্রশাসন যত ছোটই হোক তা রাষ্ট্রের' (পৃ. ৬৭) তাকে খুশি রাখতে হয়। অথচ এই কথার পেছনে যে তাঁর মন্তব্য ঠিক উল্টো তাও আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা ও অভ্যাসের ধরাবাঁধা পথ থেকে বেরিয়ে আসতে তাই সাধন চট্টোপাধ্যায় এভাবে তাঁর ভাষা ও আঙ্গিককে করে তোলেন বিষয়ের মতোই শাণিত। আখ্যানের শেষে দেখি কোমায় থাকা শশধরের মস্তিষ্কেরও মৃত্যু হয়েছে, ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেছে। ভেন্টিলেশনে তাঁর দেহ আছে কিন্তু মস্তিষ্ক মৃত। নলিনীকুমারের আসা এবং চলে যাওয়াও তাঁর মস্তিষ্কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে—

'তারপর সমস্তটাই হিং টিং, ঝুল কালি, অন্ধকারের লেপাপোছা পর্দা' (পৃ. ৮৬)। আখ্যানটির আরম্ভ হয়েছিল অতীতের কথা থেকে, কিন্তু শেষ হয়েছে এসে বর্তমানে, শশধরের মৃত্যু এবং নলিনীকুমারের কাহিনির হারিয়ে যাওয়ায়। আখ্যান যেন এভাবে ফিরে আসে সমে। আসলে আখ্যানে সাতপুরুষের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে যে ফ্যান্টাসি তৈরি করা হয়েছিল — তা একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশের মাধ্যম— পাগলের প্রলাপ তো নয়। সেখানেও একটা যুক্তি থাকে, রাখতে হয়। তাই শশধরের মৃত্যু এবং নলিনীকুমারের আখ্যান থেকে বহির্গমন প্রয়োজনীয় ছিল। আখ্যানকার নামের মধ্যে যেমন একইসঙ্গে অতীত এবং বর্তমানের আভাস দিয়ে এক প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিলেন অন্তিমে তার সার্থক পূরণ ঘটেছে। 'সাতপুরুষ' শব্দের মধ্যে দীর্ঘ ঐতিহ্যের আভাস ও 'ডট্ কম্' শব্দের মধ্যে আমাদের বর্তমান ডট্ কম্ যুগের প্রতি ব্যঙ্গ যেমন সার্থক প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পুরো আখ্যানে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভাবাদর্শের এক স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। ঔপনিবেশিকতা ও তার পরবর্তী নয়া সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতাবাদের নঞর্থক প্রভাব ও তার চলমান প্রতিক্রিয়া কিংবা আধুনিকোত্তরবাদ পুরো আখ্যানে ফধধারার মতো বয়ে চলা এ সমস্ত কিছুর বিপরীত এক স্বর প্রকাশ করা সম্ভবই হত না যদি এই ফ্যান্টাসি না থাকত। তাই ফ্যান্টাসি এ উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি, কেবল উপকরণ মাত্র নয়। আবার ফ্যান্টাসিকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্যে আখ্যানের সমাপ্তি অংশটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল— নয়তো আখ্যানটিই হয়ে দাঁড়াত হিং টিং ছট্। কেন্দ্রহীনতাই সাম্প্রতিক আখ্যানের বৈশিষ্ট্য। তবে কথাতন্তুকে কে কতটা কুশলতার সঙ্গে গুছিয়ে নিতে পারেন, সেটাও দেখার বিষয়। সাধন চট্টোপাধ্যায় সমাপ্তি অংশের সংযোজনের দ্বারা সেই গুছানোর কাজটুকুই করেছেন। সব মিলিয়ে 'সাতপুরুষ ডট্ কম্' এ সময়ের এক ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান বিরোধী আখ্যান। 'গুল্মলতার ইলেকট্রন' সম্বন্ধে এ সময়ের প্রখ্যাত সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেছেন তা আলোচ্য উপন্যাস সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ যথাযথ। উপন্যাসটি—

> 'আধুনিকতাবাদী প্রতিবেদনের বলয় পেরিয়ে গিয়েই সময়ের পাঠ-পাঠান্তর তুলে ধরে, আবার প্রচলিত আধুনিকোত্তরবাদী প্রতি-উপন্যাস থেকেও সযত্ন দূরত্ব রচনা করে।'[১৫]

এ অধ্যায়ের আপাত সমাপ্তি ঘোষণা করা যায় এই বলে, যে কথাকার লেখাকে সামাজিক দায়িত্ব মনে করেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব আজ অবধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত বিরোধাভাস, আপাত-জটিলতা, অনন্বয়ের তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করে যান সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর আখ্যানে এবং সেই প্রচেষ্টার সফল নির্দেশন যেমন তাঁর আখ্যানগুলো, তেমনি তা আজও অব্যাহত।

জলতিমির—

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯।

২. তপোধীর ভট্টাচার্য. প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৩. সাধন চট্টোপাধ্যায়, অক্ষরে বদ্ধজীবন, প্যা পিরাস, কলকাতা- পৃষ্ঠা-২৮-২৯।

৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৮।

৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের ভিন্নপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯ বৈশাখ-১৪১২, পৃষ্ঠা-৩৯।

৬. বাসব দাশগুপ্ত সম্পাদিত, নীললোহিত, সাধন চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা্ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা-১৩৪।

৭. তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার চক্রবর্তী সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭, পৃষ্ঠা-৫।

৮. আজকের প্রহরী, ১৪০৩।

৯. সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক শারদ সংখ্যা ১৪০২।

১০. সাধন চট্টোপাধ্যায়, অক্ষরে বদ্ধজীবন, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃষ্ঠ-৫২।

১১. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জলাই-২০০২, প্রকাশকের কথা।

১২. অমিত দাস, অনিরুদ্ধ ভৌমিক সম্পাদিত, উত্তরাধিকার (পঞ্চম বর্ষ) জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৬ (সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যা)।

১৩. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জুলাই-২০০২, পৃষ্ঠা-২২১।

১৪. Helga Nowoting, Time : The Modern and post Modern Experence, polity press, Cambridge, 1994, page-142-143

১৫. কমল চৌধুরী সম্পাদিত, স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৩৭।

১৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, নিবিড় পাঠের নন্দন, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, জানুয়ারি-২০০২, পৃষ্ঠা-১৬০।

১৭. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন কলকাতা- জুলাই ২০০২, পৃষ্ঠা-১০৪।

১৮. তপোধীর ভট্টাচার্য, নিবিড় পাঠের নন্দন, অক্ষর পাবলিকেশনস্,আগরতলা, জানুয়ারি-২০০২, পৃষ্ঠা-১৬৫।

১৯. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন কলকাতা- জুলাই ২০০২, পৃষ্ঠা-১৪০।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৪ ।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৮।

২২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮১।

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪১।

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৩।

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২০।

২৬. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা , প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, পৃষ্ঠা-১৪৭।

২৭. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন কলকাতা- জুলাই ২০০২, পৃষ্ঠা-২১৬।

২৮. তপোধীর ভট্টাচার্য, আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা-১২, ফেব্রুয়ারি-২০০৭, পৃষ্ঠা-৮০-৮১।

২৯. কমল চৌধুরী সম্পাদিত, স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২২৭-২২৮।

৩০. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন কলকাতা- জুলাই ২০০২, পৃষ্ঠা-১২৬।

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-২২১।

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮১।

৩৩. কমল চৌধুরী সম্পাদিত, স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে, দে'জ পারলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯,

পৃষ্ঠা-২২৭।

৩৪. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জুলাই-২০০২।

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৪-১৪৫।

৩৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, নিবিড় পাঠের নন্দন, অক্ষর পাবলিকেশনস্,আগরতলা, জানুয়ারি-২০০৬, পৃষ্ঠা-১৭৪।

৩৭. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জুলাই-২০০২, পৃষ্ঠা-১১৬।

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৭।

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৭-১৪৮

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৪।

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪০।

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২১।

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪০।

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৫।

৪৫. তাপস ভৌমিক, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার চক্রবর্তী সম্পাদিত কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭, পৃষ্ঠা-৭০।

৪৬. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জুলাই-২০০২, পৃষ্ঠা-১৮০।

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২০৬।

৪৮. সাধন চট্টোপাধ্যায়, অক্ষরে বদ্ধজীবন , প্যাপিরাস, কলকাতা- পৃষ্ঠা-২৩-২৪।

৪৯. বাসব দাশগুপ্ত সম্পাদিত, নীললোহিত, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা-১৭৪।

৫০. সাধন চট্টোপাধ্যায়, অক্ষরে বদ্ধজীবন , প্যাপিরাস, কলকাতা- পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬।

৫১. তপোধীর ভট্টাচার্য, নিবিড় পাঠের নন্দন, অক্ষর পাবলিকেশনস্,আগরতলা, জানুয়ারি-২০০২,

পৃষ্ঠা- ১৬৮।

৫২. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জুলাই-২০০২, পৃষ্ঠা- ১১৭।

৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৮।

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১২৩।

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৫।

৫৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, নিবিড় পাঠের নন্দন, অক্ষর পাবলিকেশনস্,আগরতলা, জানুয়ারি-২০০২, পৃষ্ঠা-১৭২।

৫৭. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জুলাই-২০০২, পৃষ্ঠা-১৯৭।

৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৬।

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১১।

৬০. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা জানুয়ারি, ২০০৮।

৬১. বাসব দাশগুপ্ত সম্পাদিত, নীললোহিত ১০, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা- ২৮-২৯।

৬২. সাধন চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উপন্যাস, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- জুলাই-২০০২, পৃষ্ঠা-১৬৪।

৬৩. তদেব।

৬৪. তদেব।

৬৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, নিবিড় পাঠের নন্দন, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, জানুয়ারি ২০০২ পৃষ্ঠা-১৬৩।

সাতপুরুষ ডট্ কম্

১. সাধন চট্টোপাধ্যায় ঞ্ম সাতপুরুষ ডট্ কম্, যৌথ খামার, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ-২০০৫,প্রচ্ছদ।

২. তাপস ভৌমিক (স.) প্রাক্ শারদসংখ্যা ১৪১৫, মে-আগস্ট ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৪৯।

৩.	সাধন চট্টোপাধ্যায়, অক্ষরে বদ্ধজীবন, প্যাপিরাস, কলকাতা।

৪.	সাধন চট্টোপাধ্যায়, সাতপুরুষ ডট্ কম্, যৌথখামার, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ-২০০৫,পৃষ্ঠা ৭০।

৫.	তদেব, পৃষ্ঠা-৭১।

৬.	তদেব, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬।

৭.	তদেব, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।

৮.	তদেব, পৃষ্ঠা ৮১।

৯.	তদেব, পৃষ্ঠা ৯।

১০.	তাপস ভৌমিক (স.) প্রাক্ শারদ সংখ্যা, ১৪১৫, মে-আগস্ট ২০০৮, পৃষ্ঠা-২৭।

১১.	সাধন চট্টোপাধ্যায়, সাতপুরুষ ডট্ কম্, যৌথখামার, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, পৃষ্ঠা-১৭।

১২.	তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৪১২, পৃষ্ঠা-৫১।

১৩.	তাপস ভৌমিক (স.) প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, মে-আগস্ট ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৫০।

১৪.	সাধন চট্টোপাধ্যায়, সাতপুরুষ ডট্ কম্, যৌথখামার, কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৫৮।

১৫.	তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।